সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-৭০০০৭৩

উৎসর্গ

গৌরী আইয়ুব

এবং

আবু সয়ীদ আইয়ুবকে

এই গ্রন্থের প্রায় সমস্ত রচনাই এক সময় সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় সনাতন পাঠকের কলমে প্রকাশিত হয়েছে।

এই লেখকের

নদীর ওপার

দৃষ্টিকোণ

ভালবাসার দুঃখ

আকাশ পাতাল

উত্তরাধিকার

বেঁচে থাকার নেশা

শ্রেষ্ঠ গল্প

নীল লোহিতের বিশেষ দ্রষ্টব্য

বরণীয় মানুষ স্মরণীয় বিচার

এক সময় সাহিত্য ছিল, বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় ফুলে ফলে সজ্জিত একটি মহাদ্রুমের মতন অস্তিত্ব। এখন, আধুনিককালে, নানা জিনিসের ছিমছাম গড়নের মতন, সাহিত্যের শরীরও বোধ হয় বিস্তার ছেড়ে, ক্রমশ একমুখী হতে চাইছে। এরকমই তো মনে হয়।

প্রথমেই বলা যায়, সাহিত্য থেকে আমরা বোধ হয় নাটককে হারাচ্ছি। নাটক ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে, এখনকার কোনো নাটকের মঞ্চ সাফল্য আগেকার দিনে চিন্তাই করা যেত না—কিন্তু এই সব নাটক এখন আর সাহিত্যের অঙ্গ নয়। কোনো সাহিত্য সংবাদে এই সব নাটকের আলোচনা আর স্থান পায় না, সিনেমা-থিয়েটারের পাতাতেই তারা সীমাবদ্ধ। নাটক রচনার ভারও এখন মুখ্যত গ্রহণ করেন এমন ব্যক্তিরা যাঁরা মঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। নানা রকম কলাকৌশলে সেই সব নাটক চিত্তগ্রাহী হয় ঠিকই, কিন্তু তাতে যে রস থাকে, তা ঠিক সাহিত্য রস নয়। দু' একটি নাটক মাঝে মাঝে এদিকে-ওদিকে ছাপা হয় বটে, যা খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের রচনা, কিন্তু মঞ্চ সেগুলি সাধারণত ছোঁয় না, ছুঁলে, দর্শকেরা তেমন পছন্দ করে না। অথচ, আমাদের এখন অনেক নাট্যমঞ্চ ও নাট্য সম্প্রদায়ই রুচিশীল এবং চিন্তার উদ্রেককারী নাটক প্রযোজনা করছেন, কিন্তু তাতে যে রস আমরা পাচ্ছি, তা চলচ্চিত্রেরই মতন আলাদা একটা শিল্পরস, কিন্তু সাহিত্য রস নয় নিশ্চিত।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, বাংলা নাট্যসাহিত্য নামে কিছু কখনোই যেন ঠিক দানা বাঁধেনি। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, গিরিশচন্দ্র যে রাশি রাশি নাটক লিখেছেন, তার মঞ্চ-উপযোগিতা থাকলেও, তাতে সাহিত্য-গুণ প্রায় কিছুই নেই বললেই চলে।

গৈরিশী ছন্দ আসলে একটি অচল আধুলি। তবু সাহিত্যের ক্লাসের ছাত্রদের বছরের পর বছর ঐ জিনিস পড়ানো হয়। নাট্যসাহিত্য বা নাট্যপ্রবাহ নাম দিয়ে যে বৃহদাকার বইগুলি লেখা হয়, তার মধ্যে দূরবীন দিয়ে খুঁজলেও একটিও সফল সাহিত্য-নাটক খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের কথা আলাদা, আমি আগেই বলেছি। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সব ব্যাপারটাই আলাদা।

নাটকের পরই, মনে পড়ে সমালোচনা সাহিত্য, এমনকি প্রবন্ধ সাহিত্যের কথা। বছর দশেকের মধ্যে আমি এমন একটাও সমালোচনা বা প্রবন্ধের বই পড়িনি, যা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হবার দিকে চোখ রেখে রচিত নয়। হয়তো উপায়ও নেই, ছাত্ররা বাধ্য হয়ে না কিনলে ঐ সব বই এখন আর কেউ কিনবে না, গ্রন্থকারের সকল পরিশ্রম জলে যাবে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত যেরকম প্রবন্ধের বই রচনা করেছেন, সেই রকম প্রবন্ধের বই আজকাল কোথায় বেরোয়? যেসব প্রবন্ধকে আমরা সৃষ্টিশীল সাহিত্যেরই অন্তর্গত বলে জেনেছি, সেরকম আজকাল আর কে লিখছেন? মনে হয়, প্রবন্ধ নামের জিনিসটি ক্রমশ ছাত্রপাঠ্য বইতেই আশ্রয় নিতে চলেছে।

এর পরে মনে আসে, হাসির রচনার কথা। নির্মল হাস্যরসের গল্প-উপন্যাস আজকাল কচিৎ চোখে পড়ে। শুধু পাঠককে উৎফুল্ল করার জন্য কেউ কলম ধরেন না, সকলেরই যেন দায়িত্ব পাঠককে চিন্তায় ফেলে দেওয়া। বোধ হয়, হাস্য পরিহাসটাকে আজকাল আর আধুনিকতা কিংবা মহৎ সাহিত্যের অঙ্গ বলে মনে হয় না। রাজশেখর বসুর পর সেরকম লেখা আর কে লিখছেন? শিবরাম চক্রবর্তীর প্রধান খ্যাতি শিশু সাহিত্যেই আর সৈয়দ মুজতবা আলীর রম্যরচনাগুলি খুব মজার হলেও তাঁর উপন্যাস এবং অধিকাংশ গল্পই করুণ রসের। পরিমল গোস্বামী কিংবা প্রমথনাথ বিশীর ঈষৎ ব্যঙ্গ মিশ্রিত হাস্যরসের লেখা এক সময়ে আমরা পেয়েছি, কিন্তু উভয়েই

ইদানীং খুবই কম লেখেন। ইন্দ্রমিত্র এবং হিমানীশ গোস্বামীর দু' একটা রচনা এখনো চোখে পড়ে, কিন্তু এঁরা উভয়েই খুব কৃপণ। পরবর্তীকালের তরুণদের প্রায় প্রত্যেকের লেখাই বড় বেশী গম্ভীর। সাহিত্য থেকে হাস্যরসটা বোধ হয় উঠেই গেল।

এর পরে আমি কবিতার নাম করতে চাই। এটা অনেকের কাছেই নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্যজনক মনে হবে। কারণ, প্রতিদিন কবির সংখ্যা বাড়ছে, প্রতিটি শহর-গঞ্জ থেকে বেরুচ্ছে কবিতা পত্রিকা, পাড়ায় পাড়ায় ক্রিকেট খেলোয়াড়ের চেয়েও কবির সংখ্যা অনেক বেশী। তবু আমি এ কথা বলছি কেন? কিন্তু কবিরা কি সাহিত্যিক? তা হলে, কবি আর সাহিত্যিক, দুটি আলাদা নাম আছে কেন? আমার ধারণা, কবিতা ক্রমশ মূল সাহিত্য থেকে সরে গিয়ে একটা আলাদা শিল্পরূপ হতে যাচ্ছে। এর ভাষা, এর বাক্ প্রয়োগ দিন-দিনই বদলে গিয়ে এমন একটা রূপ নিচ্ছে, যার রস গ্রহণ করতে পারে এক বিশেষ ধরনের পাঠক। যাঁরা কবিতা লেখেন কিংবা কবিতা-বিচার প্রবন্ধ লেখা মনস্থ করেছেন, মূলত তাঁরাই কবিতার পাঠক, এর বাইরেও যাঁরা আছেন, তাঁরা মুষ্টিমেয়। কবিতা যখন থেকে কাহিনীকে ছেড়েছে, (কাহিনীর ভার নিয়েছে উপন্যাস নামে আর একটি অর্বাচীন জিনিস—এবং তার প্রতাপ ও জনপ্রিয়তা হু-হু করে বাড়ছে) তার পর থেকেই সে নিজেকে ঢেকে রাখতে শুরু করেছে একটি কঠিন বর্মে। এখন যেন উপন্যাস সর্বসাধারণের, আর কবিতা বিশেষ একটি শ্রেণীর। যে হেতু গণ্ডিটা ছোট হয়ে আসছে, সেই জন্যই অভিমানে ও অহংকারে কবিতা বোধ হয় সাহিত্যের চেয়েও উঁচু কোনো শিল্পস্থান দাবি করবে অদূর ভবিষ্যতে। কিংবা ইতিমধ্যেই করে বসেছে।

আমি এই রচনার শিরোনাম দিয়েছি সাহিত্যের শরীর। এই পর্যন্ত লিখে মনে হচ্ছে, এর থেকেও আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু হতে পারতো 'শরীরের সাহিত্য।'

বিশ্ব সংসারে বোধ হয় কোনো কথাই আর নতুন নেই। সব কথাই কিছুদিন অন্তর ঘুরে ফিরে আসে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ-কথা খাটে। রবীন্দ্রনাথ ও সুরেশ সমাজপতির সম্পর্কের কাহিনী এখন ইতিহাসের পর্যায়ে। ওই-কাহিনী পাঠ করলে মনে হয়, ওই রকম যুগ বুঝি শেষ হয়ে গেছে। বস্তুত, তা নয়। সুরেশ সমাজপতিরা প্রত্যেক যুগেই ঘুরে ফিরে আসেন—এবং ঠিক একই রকম কথা তাঁদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়। যদিও একথা মনে রাখা উচিত যে, সুরেশ সমাজপতি মহাশয় ছিলেন প্রকৃতই পণ্ডিত এবং সজ্জন। কিন্তু যে-কারণেই হোক, বোধ হয় তাঁর সমাজপতি পদবীর জন্যই—তাঁর নাম শুনলেই এক প্রচণ্ড নীতিবাগীশ বলে মনে হয় এখন। অর্থাৎ, তিনি যেন বাংলা সাহিত্যের মিসেস গ্রাণ্ডি।

সুরেশ সমাজপতি প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথের লেখার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বটে, কিন্তু পূর্ণ প্রতিভার রবীন্দ্রনাথকে তিনি সহ্য করতে পারেননি। সমসাময়িক প্রতিভাকে অনেকেই সহ্য করতে পারে না। বিদ্যাসাগর মশাই মাইকেলের শুভার্থী এবং বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও, কবি হিসেবে তিনি বড় মনে করতেন ভারতচন্দ্রকে। পরে মাইকেল সম্পর্কে যখন যুগান্তকারী প্রতিভা হিসেবে গুজব রটে যায়, তখন লোকে অনেক দিন ধরেই সেটা বিশ্বাস করেছে। হেম-মধু-বঙ্কিম-নবীনের যুগ বাংলা সাহিত্যের একটি স্বর্ণযুগ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে—তারপর রবীন্দ্রনাথ যখন এলেন, তখন অনেকেই সেটা হীরক যুগ বলে মেনে নিতে পারেননি। তখনও স্বর্ণযুগের ছটার মোহ চোখে লেগে আছে। রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনে বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণ কম সহ্য করতে হয়নি। আগের যুগের তুলনায় রবীন্দ্রনাথকে মনে

হয়েছে তরল। রবীন্দ্রনাথ সমাজের শালীনতা নষ্ট করেছেন—এমন অভিযোগ করতেও কেউ কেউ ছাড়েননি—যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক, তবু এরকম হয়েছিল।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি পরজন্মে সজনীকান্ত দাস এই নাম গ্রহণ করেন। এখানেও সেই একই কথা খাটে যে, সজনীকান্ত স্বয়ং ছিলেন বিদগ্ধ এবং রসবোধ সমৃদ্ধ—তাঁর নিজের রচনাশক্তিও কম ছিল না। তবু তিনি সমকালীন সাহিত্যের ধারাটি সহ্য করতে পারেননি। তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে এই বলে নালিশ করেছিলেন যে, আধুনিক লেখকরা সাহিত্যের শালীনতা নষ্ট করছে। অবিকল একই রকম ভাষাতেই বিভিন্ন যুগের অভিযোগ।

একালে, সুরেশ সমাজপতি বা সজনীকান্ত দাসের নতুন কী নাম হয়েছে, তা এখনো ঠিক হয়নি—কিন্তু ওঁদের সন্তান-সন্ততির অভাব নেই। এঁরাও সময়ে সময়েই বলেন যে, সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে কী অরাজকতা চলছে, লেখকরা পবিত্র ভাষাকে কলুষিত করছেন। এঁদের আন্তরিকতার অভাব নেই—কিন্তু এঁরাও সমকালকে ঠিক সহ্য করতে পারেন না। তারাশঙ্কর-মানিক-বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন মহৎ উপন্যাস আর কেউ রচনা করছেন না কিংবা জীবনানন্দ-সুধীন্দ্র-বুদ্ধদেব-এর মতন কবিতার পরিপূর্ণ রূপ আজকাল আর চোখে পড়ে না—এরকম অনুযোগ কে না শুনেছেন ?

সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটু দূরত্ব না হলে বোধ হয় ঠিক বিচার সম্ভব নয়। যে লেখা পড়লে মনে হয়, ইচ্ছে করলে বোধ হয় আমিও এ-রকম লিখতে পারতুম সে লেখাকে মহৎ সাহিত্য বলে মেনে নেওয়া সহজ নয়। আসলে, ইচ্ছে করলে সকলেই এরকম লিখতে পারেন না, তবু যে মনে হয়, তার কারণ, ওই ভাষা পাঠকের মুখের ভাষার মতন, চরিত্রগুলিও তার দেখা চরিত্র। এবং সমকালীন প্রণয় কাহিনীকে মনে হয় হালকা রস। বিগত যুগের প্রণয় কাহিনীকেই মনে হয় যেন চিরকালীন।

সমালোচকদের প্রাণের টান থাকে ক্লাসিকসগুলির দিকে। সময়ের দূরত্বে এবং কিছু অপরিচয়ের ফলে, বিগত কালের ভাষাকে মনে হয় গাম্ভীর্যপূর্ণ, যে-কোনো ভাবালু দার্শনিকতাকে মনে হয় জীবন চেতনা। একটা জিনিস তাঁরা লক্ষ করেন না যে, তাঁদের মুখের ভাষাও অনেক বদলে গেছে। মুখের ভাষা বদলালে সাহিত্যের ভাষা বদলাবেই— কারোর সাধ্য নেই আটকাবার। রবীন্দ্রনাথ যে-ভাষায় কথা বলতেন, আজকের জীবনে সেই ভাষায় কারুকে কথাবার্তা চালাতে দেখলে আমাদের হাসি পাবে। অনেকে অবশ্য সে চেষ্টা করেন এবং প্রকৃতই আমাদের হাসির উদ্রেক করেন। যেমন আজকাল মুখের ভাষাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে সুষ্ঠু করে বলার দিন চলে গেছে—ঠিক সেই রকম ভাবেই সাহিত্যের ভাষা হয়ে আসছে নিরাভরণ। সমালোচক এটাকে ঠিক মেনে নিতে পারেন না—তাঁর মনে হয়, সাহিত্যে সাংবাদিকতার উপদ্রব ঘটছে কিংবা লেখকরা ইচ্ছে করে চটুল করছেন; কিন্তু বঙ্কিমবাবু যে-ভাষায় উপন্যাস লিখেছেন, তাঁর যুগে সেটাও যে ছিল সাংবাদিকতার ভাষা এটা তাঁরা সম্পূর্ণ ভুলে যান।

আগেকার তুলনায় এ-যুগের সাহিত্য খারাপ হচ্ছে—এই অভিযোগ করার আগে এক মুহূর্ত থমকে গিয়ে কি ভাবা উচিত নয় যে, প্রত্যেক যুগেই এরকম অভিযোগ এসেছে, তা সত্ত্বেও সাহিত্য ঠিক বেঁচে থেকে এগিয়ে যায়।

কয়েকজন সাহিত্যিক এক সভায় তাঁদের রচনার সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার কী সম্পর্ক—এ-বিষয়ে কিছু বলছিলেন। এক কোণে বসে চুপ করে শুনছিলাম আমি।

শ্রোতারা অধিকাংশই ছাত্র, পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে মুখ, পোশাকের অনেক রকম বৈচিত্র্য আছে। বক্তৃতা শোনার ব্যাপারেও তাঁরা বেশ আগ্রহী।

যেই না সাহিত্যিকদের বক্তৃতা শেষ হলো অমনি শ্রোতাদের মধ্য থেকে অনেকেই উঠে দাঁড়িয়ে একের পর প্রশ্ন তুলতে লাগলেন। প্রশ্ন না বলে প্রশ্নবাণই বলা চলে। লক্ষণটি শুভ।

এই তো কিছুকাল আগে আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন কোনো সভায় এরকমভাবে আমরা মুখ খুলতে পারতাম না। আমাদের লাজুকতা বেশী ছিল। অধ্যক্ষ যখন জোরে জোরে জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কারুর কোনও প্রশ্ন আছে? উঠে দাঁড়াও—তখন আমাদের অনেক প্রশ্ন থাকলেও উঠে দাঁড়াতাম না, একে-ওকে ঠেলাঠেলি করতুম। আমাদের মনে এই লজ্জাটি থাকতো, আমাদের প্রশ্ন এই বিদ্বজ্জন সমাজে ঠিকমতন ভাষায় যদি গুছিয়ে বলতে না পারি?

এখন বেশ একটা যুব-যুব হুজুগ এসেছে। এখনকার ছেলেরা উঠে দাঁড়িয়ে দুমদাম যা খুশী বলতে পারে। এটা নিশ্চয়ই একটা ভালো ব্যাপার। যুবা বয়েসেই সবাই প্রাজ্ঞ হয় না, তবু মনের প্রশ্ন মনের মধ্যে চেপে না রেখে বাইরে প্রকাশ করে ফেলাই স্বাস্থ্যসম্মত।

আমি লক্ষ করলুম যে, অধিকাংশ যুবারই প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রধান সুর ধ্বনিত। আজকের সাহিত্য কেন যুবকদের পথ দেখাতে

পারছে না? এই যে হতাশা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, সামাজিক অসঙ্গতি —এর থেকে উত্তরণের পথ কী?

সকলেই খুব বিনীত নয়। কেউ কেউ রীতিমতন ধমকের সুরে সাহিত্যিকদের জিজ্ঞেস করছিলেন, আপনাদের লেখার আসল বক্তব্যটি কী বলুন তো। অত ভাষার কেরামতি আমরা বুঝি না।

কেউ বললেন, অনেকক্ষণ ধরে তো শিল্পটিল্প বললেন, আপনার লেখায় গরীবদের কথা আছে?

কেউ বললেন, আপনারা শুধু প্রেমের গল্প লিখে আর-সব সমস্যাকে ধামা চাপা দিতে চান!

কেউ বললেন, আপনারা শুধু চিন্তা করেন কিসে বই বেশী বিক্রী হবে, বেশী টাকা পাওয়া যাবে? দেশের কথা চিন্তা করেন না!

কেউ বললেন, ম্যাকসিম গোর্কির মাদার কিংবা দীনবন্ধুর নীলদর্পণ যেমন একটা সংগঠনমূলক আদর্শ রেখেছে, সে-রকম কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছেন আপনারা?

লক্ষ করলুম, লেখকরা একটু কোণ-ঠাসা হয়ে পড়ছেন। লেখকরা কদাচিৎ ভালো তার্কিক কিংবা তীক্ষ্ণ বক্তা হন। সুতরাং তাঁরা কেউ পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন, কেউ রেগে যাচ্ছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে যে-কয়েকজন সত্যিই লেখকদের শুধু ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা জানতে আগ্রহী, তাঁরা কেউ পাত্তা পাচ্ছিলেন না অন্যদের প্রশ্নের প্রবল ঝড়ের মধ্যে।

এই সভা থেকে একটি চিত্র পাওয়া যায়। অধিকাংশ শ্রোতাই, (অর্থাৎ পাঠকও। ওরা নিশ্চয়ই ঐ-সব লেখকের রচনা পড়েছেন, নইলে সভাতে এলেনই বা কেন আর ধৈর্য ধরে অতক্ষণ বসে শুনলেনই বা কেন।) আজকাল সাহিত্যের মধ্যে একটা কোনো বক্তব্য দাবি করে। এবং সে-বক্তব্য সমাজ সংগঠনমূলক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। উচিত বা অনুচিত যা-ই হোক—এই দাবিই যে অধিকাংশ পাঠকের, এতে কোনো দ্বিমত নেই। এটা একটা বর্তমান চিত্র।

এই সব প্রশ্নকারীদের যে কী উত্তর দেওয়া যেতে পারে তা আমার পক্ষে বলা অসম্ভব। কারণ, আমার মনেও অনেক প্রশ্ন জাগছিল। প্রশ্নগুলো অনেকটা এই রকম :

লেখকরা চান তাঁদের বই বেশী বিক্রী হোক, বেশী লোক পড়ুক। এখন, দেশের অধিকাংশ পাঠকই যদি বক্তব্যপ্রধান রচনা চান, তবে তাঁরাও কড়া বক্তব্যমূলক বই ভুরি-ভুরি লেখেন না কেন ?

কারুর কারুর ধারণা লেখকরা আসলে কোনও কোনও সম্পাদক বা প্রকাশক বা এস্টাব্লিশমেণ্টের কাছে আত্মবিক্রয় করে থাকে। তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী লেখে। এটা যে অত্যন্ত ভুল ধারণা, তা বলাই বাহুল্য। যে লেখকের বই বিক্রী হয় না বা জনপ্রিয়তা কমে যায়— এস্টাব্লিশমেণ্ট তাকে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দেয়।

এক শ্রেণীর লেখক কড়া বক্তব্যমূলক বইও লেখেন। তাঁদের বই জনপ্রিয় হয় না কেন ? কেন এই ধরনের কোনো সভায় তাঁদের নাম শোনা যায় না ? কেন এই সব পাঠকরা বলেন না, আমরা আপনাদের বই আর পড়বোই না, এবার থেকে পড়বো শুধু অমুক অমুকের লেখা, যাঁর লেখা সৎ উপদেশে ভর্তি ?

তাহলে কি ব্যাপারটা এই দাঁড়ায় যে, এখনকার যুবকরা প্রেমের কাহিনীই পড়ে এবং অসন্তুষ্ট হয়। আর যে-সব বইতে সমাজ সংগঠনমূলক বক্তব্য থাকে, সেগুলো ছুঁয়েও দেখে না ?

রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা জীবনানন্দ দাশের কবিতা কিংবা 'শেষের কবিতা' বা পুতুল নাচের ইতিকথার মতন উপন্যাস কিংবা হ্যামলেট বা ওয়েটিং ফর গোদোর মতন নাটক—এলোমেলো উদাহরণ দিলুম—এগুলিতে সামাজিক সংস্কারের কোনো বক্তব্যই নেই। সুতরাং এ-সব কি আর পড়বার দরকার নেই ? আবার এই সব রচনা কি মানুষকে জীবনে সুখী হতে শেখায় না ?

সাহিত্য বা শিল্পের মান কী হবে বা নতুনভাবে বদলাবে কি ? বর্তমান পর্যন্ত সাহিত্য ও শিল্পের যে মান সেই অনুসারে গোর্কির

'মাদার' কিংবা দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'-এর আংশিক উপযোগিতা থাকলেও মোটেই উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি নয়। এগুলিকে বলা যায়, টাইম সার্ভার। অথচ প্রতিটি লেখকেরই আগ্রহ থাকে, পারুক বা না পারুক, শিল্প সৃষ্টি করারই।

মানুষের প্রেম যদি পৃথিবীর কোনও ক্ষতি না করে তা হলে প্রেমের কাহিনী কী করে ক্ষতি করে? প্রেমের কাহিনী যদি দারিদ্র্য, বেকারত্ব বা বিপ্লবের স্বপ্নকে ভুলিয়ে দেয় কারুর মন থেকে, তাহলে কি স্বীকার করতে হবে না যে, ঐ সব মন বিস্মরণের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল? নীতি কথাতেও ওরা জাগরিত হয় না।

এইসব প্রশ্নই শুধু আমার মনে জাগে। উত্তর জানি না।

কিছুদিন আগে বাংলাদেশের খ্যাতনাম্নী লেখিকা রাবেয়া খাতুন এসেছিলেন কলকাতায়। কথায়-কথায় আমাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলুন তো, মেয়েদের মধ্যে লেখিকার সংখ্যা এত কম কেন? কিংবা মেয়েদের হাতে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি কেন?

সাধারণত কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হলেই এড়িয়ে যাওয়া আমার স্বভাব। সেই চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু উনি আমাকে ছাড়লেন না। তখন আমি আমতা আমতা করে বললাম, কেন, মেয়েদের কাছ থেকেও তো আমরা অনেক ভালো লেখা পেয়েছি। বিশ্ব-সাহিত্য তো বটেই, এমন কি আমাদের বাংলা সাহিত্যেও—লীলা মজুমদার, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, আপনি নিজে—

বেগম রাবেয়া খাতুন আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, সে কথা হচ্ছে না। পুরুষদের তুলনায় লেখিকাদের সংখ্যা যে অনেক কম এবং উল্লেখযোগ্য সাহিত্যও মেয়েদের কাছ থেকে আমরা তুলনায় অনেক কম পেয়েছি, একথা তো সবাই জানে। এটা কেন হয়?

আমি বললাম, তার উত্তর তো আপনারাই ভালো দিতে পারবেন।

উনি বললেন, আমি আপনাদেরই মতামত জানতে চাই।

আমি শেষ পর্যন্তও ঠিকঠাক কোনো উত্তর দিতে পারিনি। এর কারণ সত্যিই আমি জানি না। কারুর যদি জানা থাকে, আমাদের জানাবেন।

আরও কিছুদিন আগে, রবীন্দ্র সদনে এক চিত্তহারী অনুষ্ঠানে লীলা মজুমদারও এই প্রশ্ন তুলেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে ছ'জন

বর্ষীয়সী লেখিকাকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সেই উপলক্ষে, লীলা মজুমদার তাঁর ভাষণে বলেছিলেন যে, নারী-শিক্ষা যখন ভাল মতন চালু হয়নি, মেয়েরা ঘর ছেড়ে তখনও বাইরে আসে না—সেই যুগেও বাংলা সাহিত্যে যতজন উল্লেখযোগ্য লেখিকা ছিলেন, তার তুলনায় এখন বহু রকম সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও লেখিকার সংখ্যা এত কম কেন?

শ্রীমতী লীলা মজুমদার স্বয়ং বাংলা সাহিত্যে একজন গর্ব করার মতন লেখিকা। বেগম রাবেয়া খাতুনও অত্যন্ত শক্তিমতী, বুদ্ধিমতী লেখিকা, তাঁর 'সাহেব বাজার', 'রাজার বাগ', 'শাহী বাগ' কয়েকটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য রচনা আছে। এঁরা নিজেদের সার্থকতাতেই শুধু তৃপ্ত নন, সাহিত্যে নারীদের স্থান সম্পর্কেও চিন্তা করেন।

এখনো, পৃথিবীতে প্রায় সব ক্ষেত্রেই নারীদের তুলনায় কৃতী পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশী। এমন কি রান্না কিংবা নাচ যা মেয়েদেরই ব্যাপার বলে আমরা মনে করি, তাতেও কিন্তু শ্রেষ্ঠাংশে পুরুষরাই। বিশ্ববিখ্যাত হোটেলগুলির প্রধান পাচকরা নারী নন। নুরিয়েভ, উদয়শঙ্কর বা বিরজু মহারাজের তুল্য খ্যাতি কোনো নর্তকীর নেই।

সে যা-ই হোক সাহিত্যটা যেন সর্বাংশে পুরুষদেরই ব্যাপার বলে মনে হয়। সাহিত্য সম্পর্কে যে-কোনো আলোচনা, যে-কোনো চিন্তাতেই এর প্রতিফলন পড়ে। দু-একজন ভার্জিনিয়া উলফ বা মেরি ম্যাকার্থিকে আমরা যেন ব্যতিক্রম বলেই মনে করি। জানি, বর্তমানকালের অনেক লেখিকা এতে আপত্তি করবেন। অনেক লেখিকার রচনাই আমি আগ্রহের সঙ্গে পড়ি। কিন্তু তাঁরাও এখনো ব্যতিক্রমের মধ্যেই গণ্য। ব্যতিক্রম বলেই বেশী আকর্ষণীয়। বাংলা ভাষায় এখন কবির সংখ্যা যদি, কমিয়ে বলছি, তিনশোও হয়—এর মধ্যেও দশজনের বেশী মেয়ের কবিতা এখনো মুদ্রণযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

কেউ কেউ বলতে পারেন, সাহিত্য রচনার জন্য অভিজ্ঞতার গণ্ডি যতটা বিস্তৃত হওয়া দরকার, মেয়েদের ততটা আয়ত্ত করার সুযোগ এখনো নেই। মেয়েরা এখনো বাইরে বেরুলেও কারুর সঙ্গেই বেরোয়। একা একা যদৃচ্ছা ঘুরে বেড়াবার অধিকার মেয়েদের এখনো দেয়নি এই সমাজ। কথাটা ঠিক যুক্তিসিদ্ধ নয়। পাশ্চাত্যের মেয়েরা এই স্বাধীনতা অনেকখানি পেয়েছে, কিন্তু সে-সব জায়গাতেও লেখিকার সংখ্যা মোটেই বাড়েনি। তা ছাড়া, অভিজ্ঞতার জন্য সব সময় বাইরে ঘুরে বেড়াবার দরকারও তো নেই। অনেক বিখ্যাত লেখকই অলস ও ঘরকুনো। ফ্রানৎস কাফকা বা বিমল কর ধরনের লেখকরা কদাচিৎ একলা বাইরে ঘোরাঘুরি করেছেন। কাফকা সম্পর্কে এ কথা পড়েছি তাঁর জীবনীতে, এবং বিমল কর এক জায়গায় বলেছেন, লেখার জন্য তাঁর অভিজ্ঞতার দরকার হয় না, কল্পনাই তাঁর প্রধান উপজীব্য।

এই অভিজ্ঞতার প্রশ্নে লীলা মজুমদার বলেছিলেন, অন্য গল্প-কবিতার কথা বাদ দিলেও, শিশু-সাহিত্যে তো মেয়েরা অনেক কিছু দিতে পারতো। বস্তুত, শিশুদের সম্পর্কে মেয়েদের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত হাজারগুণ বেশী। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের গল্প বলেও ভোলাতে হয় তাদের। সেই হিসেবে, শিশু-সাহিত্যটাই মেয়েদের একচেটিয়া হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঘটনা তা নয়। পৃথিবীর নাম-করা লেখিকাদের মধ্যে অনেকেই বাচ্চাদের জন্য এক লাইনও লেখেননি! এও এক অদ্ভুত ব্যাপার।

লেখকদের নাকি অবজারভেশন বা নিরীক্ষণ ক্ষমতা বেশী থাকে। কিন্তু আমি তো দেখেছি, ছেলেদের তুলনায় মেয়েরাই অনেক ব্যাপার লক্ষ করে বেশী। ছ' মাস আগে একটা নেমন্তন্ন বাড়িতে একজন পুরুষ বা নারী কী জামা বা কী শাড়ি পরেছিল, অনেক মেয়েই তা বলে দিতে পারে। কোনো ছেলেই তা পারবে না। কিংবা কারুর কথা বলার আলাদা ভঙ্গি কিংবা চেহারার কোনো খুঁত—এটা মেয়েরাই আগে লক্ষ করে। একজন ফেরিওয়ালার মুখের সঙ্গে ছবি বিশ্বাসের মুখের কোথায় মিল আছে, মেয়েরা তা বলে দেয়। আড়ালে পরচর্চা করা মেয়েদের একটি প্রধান ব্যসন। কিন্তু পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বেশী না হলে কি কেউ পরচর্চা করতে পারে? পক্ষিচর্চা কিংবা বাগান-চর্চার মতন পরচর্চাতেও অনেক মনোযোগ লাগে।

সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক আছে সাহিত্য পাঠের। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা কম বই পড়ে, এ কথাও কিছুতেইবলা যাবে না। অনেক নারীই খুব ভালো পাঠিকা, কিন্তু লিখতে চান না। কেন কে জানে!

ছেলেরা লেখে কেন? অমরত্বের জন্য? মেয়েরা কি অমর হতে চায় না? কিংবা যেসব ছেলে বাল্যকাল থেকেই লেখে, তাদের মনে একটা হয়তো সুপ্ত ইচ্ছে থাকে যে লেখায় সার্থক হতে পারলে আর কোনো কাজ করতে হবে না। অর্থাৎ লেখাটাই হবে জীবিকা। মেয়েরা বাল্যকাল থেকেই জীবিকার কথা চিন্তা করে না বলে লেখার কথাও ভাবে না। না, এটাও সত্যি মনে হচ্ছে না। প্রথম রচনা শুরু করার সময় সব ছেলেরই চোখের সামনে থাকে অমরত্ব, জীবিকা নয়। বরং, অনেকে এ কথাও ভাবে, লেখার সঙ্গে টাকা-পয়সার ব্যাপার জড়িয়ে ফেলা একটা পাপ। তা হলে?

ছেলেদের তুলনায় কি মেয়েরা কম পাগল হয়? একমাত্র এই একটা ব্যাপারের মধ্যেই আসল কারণটা নিহিত আছে মনে হয়।

মিঃ মেলার আপনি কী ভাবে উপন্যাস লেখেন ?

প্যারিস রিভিউ পত্রিকার একটি পুরোনো সংখ্যায় নরমান মেলারের সাক্ষাৎকার পড়ছিলাম। গল্প উপন্যাস রচনার পেছনের ইতিহাস, লেখকদের লেখার পদ্ধতি বা বাতিক সম্পর্কে আমাদের অনেক সময় কৌতূহল থাকে। নরমান মেলার বেশ সোজাসুজি উত্তর দিয়েছেন।

ঐ প্রশ্নের উত্তরে নরমান মেলার বলেছেন, তার কোনো ঠিক নেই। এক-একটা বইতে এক-এক রকম। ধরুন আমার প্রথম বই, 'দা নেকেড অ্যাণ্ড দা ডেড'—লিখেছিলাম টাইপরাইটারে। সপ্তাহে চারদিন লিখতাম—সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি।

ধরাবাঁধা সময়ে ?

হ্যাঁ। ঘুম থেকে উঠতাম সকাল আটটা সাড়ে আটটায়। দশটা থেকে লেখা শুরু। সাড়ে বারোটা পর্যন্ত, তারপর খাওয়া-দাওয়া। আবার কাজে বসতাম আড়াইটে-তিনটে থেকে আবার দু' আড়াই ঘণ্টা। বিকেলের দিকে এক বোতল বিয়ার লাগতো চাঙ্গা হবার জন্য। তবে পাঁচ ঘণ্টা কাজ করতামই। দিনে অন্তত টাইপ করা সাত পাতা। সাত মাস বাদে লেখাটি শেষ হলো। কাটাকুটি করতে লাগলো আরও চার মাস—তখন লেখাটা আদ্দেকে গিয়ে দাঁড়ালো। প্রথমবার আমি যা লিখেছিলাম, তাই-ই যদি ছাপা হতো তাহলে এটা নিছক একটা যুদ্ধের উপন্যাসই হতো, আর কিছু না।

পুরো বইটা কী ভাবে লিখলেন ?

প্রথম বইটা শেষ হওয়ার দু' মাস বাদে আমি শুরু করলাম

'বারবারি শোর।' আগে নাম দিয়েছিলাম অন্য। প্যারিসে বসে লিখছিলাম, প্রথম পঞ্চাশ পাতা বেশ সহজেই লেখা হয়ে গেল। কিন্তু তারপর খেয়াল হলো, মিসেস গুনেভের-এর চরিত্রের ওপরে ক্রিস্টোফার ইসারউডের 'আই অ্যাম আ ক্যামেরা'র স্যালি বোল্‌সের প্রভাব পড়েছে। ব্যাস, আমার লেখার দম ফুরিয়ে গেল। ঐ লেখাটা সরিয়ে রাখলাম, মনে হলো জীবনে আর কোনোদিন ওটা শেষ হবে না। আমি আর একটা শুরু করলাম। সেটার কিছু মালমশলার জন্য আমাকে ইণ্ডিয়ানাতে আসতে হয়েছিল।

লেখাটা কী বিষয়ে?

শ্রমিকদের নিয়ে। ইভান্‌সভিল-এ একটি শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে আমার কিছু সম্পর্ক ছিল। দিন কয়েক রইলাম। তারপর লেখার জন্য চলে গেলাম জ্যামাইকায়। মাস দেড়েক লাগলো তৈরি হতেই। তারপর আরম্ভ করে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলাম। দু' সপ্তাহ লেখা চললো। হঠাৎ ঠাণ্ডা মেরে গেলাম আবার। মনে হলো ওটা আর আমার দ্বারা লেখা হবে না। আমি শ্রমিক ইউনিয়ন সম্পর্কে কিছুই জানি না। মরীয়া হয়ে আমি আগেরটাই আবার তুলে নিলাম। এবার পড়ে মনে হলো, হয়তো আবার এগুনো যেতে পারে। আসলে, প্রথম উপন্যাসের সার্থকতার পর দ্বিতীয় উপন্যাস সম্পর্কে আমি ভয় পাচ্ছিলাম। অনেক লেখকেরই এরকম হয়। যা-ই হোক, ওটা আমি শেষ করলাম হলিউডে এসে। গোটা বইটা তিনবার লিখেছিলাম। একটা পুরো গ্রীষ্ম, একটা বসন্ত লেগেছিল।

নরমান মেলারের সাক্ষাৎকারটা দীর্ঘ। আরও অনেক বিষয়ে কথা আছে। সে-সম্পর্কে বারান্তরে কথা হবে। দু' একটা জিনিস শুধু এইটুকুর মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠলো—ইনি একটা উপন্যাস বছর খানেক ধরে লেখেন। অনেক বার কাটাকুটি করেন। লেখার মালমশলার প্রয়োজনে এখানে সেখানে যেতে হয়। কোথায় বসে

লিখবেন, সেটাও একটা বিবেচ্য বিষয়—এ জন্ম ইউরোপ আমেরিকার নানা শহর পড়ে আছে। একটা লেখা শুরু করেছিলেন প্যারিসে, তারপর গেলেন জ্যামাইকায়—সেখান থেকে আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্ম হলিউডে।

এর পর আমি একজন বাঙালী লেখককে জিজ্ঞেস করলাম তাঁর লেখার পদ্ধতি সম্পর্কে। লেখকটি অবশ্য নিজের নাম প্রকাশ করতে চান না। ধরা যাক, তাঁর নাম শ্রীযুক্ত অমুক রায়।

আচ্ছা অমুকবাবু আপনি কীভাবে লেখেন ?

হাত দিয়ে, কাগজের ওপর, কলমের সাহায্যে।

আপনার লেখার কি কোনো বিশেষ পদ্ধতি আছে ?

আমি সাধারণত চেয়ার, টেবিলে লিখি। তবে, যেখানে টেবিল, সেখান থেকে পাখাটা একটু দূরে। তাই বেশী গরম লাগলে চেয়ার ছেড়ে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে বুকে বালিশ দিয়ে লিখি। এটাকে অবশ্য কোনো বিশেষ পদ্ধতি বলে কি না আমি জানি না।

আপনি দিনে কতক্ষণ লেখেন ? একটা উপন্যাস লিখতে আপনার কতদিন সময় লাগে ?

একটা উপন্যাস শেষ করতে সময় লাগে বড় জোর মাস দুয়েক। আমার লেখা 'রক্ত সায়াহ্ন' উপন্যাসটা পড়েছো ? ওটা মোটামুটি নাম করেছিল—হিন্দী ও ইংরেজিতে অনুবাদ হচ্ছে—ঐ উপন্যাসটা আমি শেষ করেছিলাম ঠিক পঁয়ত্রিশ দিনে।

আপনি খুব তাড়াতাড়ি লিখতে পারেন বুঝি ? দিনে ক' ঘণ্টা লেখেন।

বলা যায় সারা দিন ধরেই লিখি। ঘুম থেকে উঠি সাড়ে ছ'টায়। খবরের কাগজ পড়তে সময় যায় ঘণ্টা খানেক। পুরোনো অভ্যেস, কাগজ না পড়ে পারি না। কোনো-কোনোদিন বাজার করতে যাই—তাতেও ঘণ্টা খানেক সময় নষ্ট হয়। তারপর লিখতে বসি। আমার অফিস দশটায় আরম্ভ নয়, দেরীতে। ঘণ্টা দু'য়েক সময়

পাই লেখার। তারপর অফিস। অফিসে অনেক কাজ। অফিস থেকে বেরিয়ে তক্ষুনি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না। তাছাড়া ট্রামে বাসে সাংঘাতিক ভিড়, ট্যাক্সিও পাওয়া যায় না। রাত্তিরে খেয়ে দেয়ে সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি। সারাদিন ধরেই, যখন যা কাজই করি না কেন, মাথার মধ্যে সেই লেখার কথাই ঘোরে। আমাদের পাড়াটায় বড্ড গোলমাল। অনেক রাত্তিরে সব শান্ত না হলে লেখায় মন বসানো যায় না। কোনো-কোনো রাত্তিরে লিখতে শুরু করলে সারা রাত কেটে যায়। কিন্তু রাত জেগে লিখলে পরের দিন অফিসে যেতে কষ্ট হয়—তাই রাত জাগি না সাধারণত। এই ভাবেই লেখা হয়ে যায়। একটা শেষ হলেই আর একটা ধরি।

আচ্ছা অমুকবাবু, আপনি বাইরে বেড়াতে-টেড়াতে যান না? লেখার উপাদান পান কোথা থেকে?

আগে যেতাম। এখন যে চাকরিতে বাঁধা। বছরে এক মাস ছুটি—তাও অসুখ-বিসুখ হলে, টাকা পয়সাও পাবলিশারদের কাছ থেকে ঠিক সময় মতন পেলে···

আপনার কি মনে হয় না—কালিম্পং কি শিলং-এ কিংবা পুরীতে কোনো হোটেল ভাড়া করে, নির্জনে যদি লিখতে পারেন—সুন্দর প্রকৃতির দৃশ্যে মাথাটাও পরিষ্কার হয়—তাহলে কি আপনার লেখা আরও ভালো হতে পারতো না?

আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছো? একজন বয়স্ক লেখকের সঙ্গে ইয়ার্কি করতে তোমার লজ্জা হয় না?

অলৌকিক ঘটনায় আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু মাঝে-মাঝে দু' একটা বড় অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। একদিন সকালবেলা দেখি আমার বসবার ঘরে টেবিলের ওপর একটা পেপার-ব্যাক ইংরেজী উপন্যাস পড়ে আছে। বইখানা আমার নয়, আমি আগে কখনো চোখে দেখিনি। আগে নামও শুনিনি। বইখানা ওখানে কী করে এলো? একমাত্র উপায় হতে পারে, কোনো বন্ধুবান্ধব বইটা হাতে করে নিয়ে এসেছিল, ভুল করে ফেলে গেছে। কিন্তু গত দু' দিনের মধ্যে আমার বাড়িতে কেউ আসেনি—তার আগে কেউ ফেলে গেলে দু' দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই আমার চোখে পড়তো। পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের জিজ্ঞেস করেছি, ও-বই কারুর নয়। এ তো এক ধাঁধা! যা-ই হোক, একখানা বই তো আর আকাশ থেকে পড়তে পারে না। নিশ্চয়ই কেউ ফেলেই গেছে। (যাঁর বই, তিনি উপযুক্ত প্রমাণ দেখিয়ে ফেরত নিয়ে যেতে পারেন)।

কৌতূহলী হয়ে বইখানার পাতা ওল্টাতে লাগলাম। এর পরেই আসল বিস্ময়।

আজকাল আমি আধুনিক ইংরেজী উপন্যাস বিশেষ পড়ি না—গোয়েন্দাকাহিনী ছাড়া। হালফিলের ইংরেজী-মার্কিন উপন্যাস বাংলা উপন্যাসের চেয়েও অনেক খারাপ। সারা পৃথিবীব্যাপীই, উপন্যাসের দুর্দিন—অথবা উপন্যাস তার চরিত্র অতি দ্রুত পাল্টাতে শুরু করেছে। কষ্ট করে ইংরেজী ভাষাতেই যদি কিছু পড়তে হয়, তা হলে ক্লাসিকস পড়বো, যা পড়ে এখনো আনন্দ পাওয়া যায়—রগরগে যৌন বর্ণনা বা মারামারির কথা পড়তে যাবো কেন?

এই বইখানাও উচ্চাঙ্গের কিছু নয়, ভাষায় সাহিত্যের স্পর্শ

থাকলেও কাঁচা-কাঁচা গন্ধ আছে। কিন্তু বইখানার নায়কের সঙ্গে আমার নিজের জীবন ও সংসারের অনেকখানি মিল। এইজন্যই কি কেউ বইখানি আমার আগোচরে ফেলে রেখে গেছে ?

উপন্যাসখানির নাম, 'অ্যান আনসার ফ্রম লিম্বো', লেখকের নাম ব্রায়ান মুর। এই লেখক সম্পর্কে আমার কোনো পূর্বঅভিজ্ঞতা নেই। তবে মলাটে লেখা আছে, ইনি 'দা লোনলি প্যাশন অব জুডিথ হার্ন' নামের আর একখানা গ্রন্থের প্রণেতা।

উপন্যাসের নায়ক ব্রেণ্ডান হু' চারটে পত্রপত্রিকায় গল্প-টল্প লিখেছে, তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঔপন্যাসিক হবার। সে একটা পত্রিকায় ছোট চাকরি করে, চাকরিটা তার একেবারেই পছন্দ নয়। তার বাড়িতে থাকে তার মা, স্ত্রী ও ছোট বাচ্চা। মা গোঁড়া ক্যাথলিক, স্ত্রী ধর্ম মানে না। ছেলেবেলায় স্কুলে পড়ার সময় 'তুমি বড় হয়ে কী হতে চাও' এইরকম একটি রচনায় সে লিখেছিল, সে বড় হয়ে কবি হতে চায়—এবং অমর কবিতা রচনা করে যাবে—তাতে মাস্টারমশাই ও ছাত্রদের উপহাসের পাত্র হয়। বড় হয়ে সে কিছুই হতে পারেনি, তার জীবন তৃপ্তিহীন স্বস্তিহীন।

এই পর্যন্ত আমি নিজের সঙ্গে বেশ মিল পাচ্ছিলাম। তার পরেই অবশ্য গল্প ঘুরে গেল। উপন্যাসের জন্য ব্রেণ্ডান-এর উদ্যোগকে বড়ই বাড়াবাড়ি মনে হয়। চাকরি করা অবস্থায় সে কিছুতেই উপন্যাস লিখতে পারবে না, সে বুঝেছে—এবং নিজের বাড়িতে স্থানাভাব বলে অন্য জায়গায় ঘর ভাড়া নিতে হবে। এত উদ্যোগ-আয়োজন করেও সাহেবরা আজকাল এত খারাপ সব বই লেখে কী করে ?

উপন্যাস লেখার জন্য মরিয়া হয়ে ব্রেণ্ডান নিজে চাকরি ছেড়ে দেয় এবং স্ত্রীকে একটি চাকরি নেওয়ায়। ওদের দেশে অবশ্য সহজে চাকরি পাওয়া যায়—সুতরাং সেদিক থেকে ঝা[illegible] পটভূমি নিউ ইয়র্ক। ঝামেলা হলো এই, ব্রে[illegible] স্ত্রী জেন [illegible] সময়েই স্বপ্ন দেখে একজন কালো মুস্কো [illegible] লোক তার ওপর

বলাৎকার করছে। অর্থাৎ মনে মনে সে এইরকম চায়। এবং হুগ্‌ও। জেন-এর সঙ্গে ব্রেণ্ডানের মায়ের গণ্ডগোলও চরমে পৌঁছয়—কারণ প্রাচীনপন্থী মা চান বাচ্চাদের ধর্ম-টর্ম শেখাতে। চরিত্রগুলির মধ্যে একমাত্র মায়ের ট্র্যাজেডিই ভালো মতন ফুটেছে। একজন লেখকের মায়ের সমস্যা নিয়েই উপন্যাসটি লেখা হলে সার্থকতার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেরকম লেখার এখন রেওয়াজ নেই—শেষ দিকে এলোমেলো হয়ে গিয়ে গল্পটি শেষ পর্যন্ত গোল্লায় যায়।

প্রথম দিকে নিজের সঙ্গে খানিকটা মিল পেলেও শেষ পর্যন্ত এটা অন্য মানুষেরই গল্প। উপন্যাস থেকে আমরা কী আশা করি? আমরা ভাবি, লেখকেরা আমাদের মনের কথা জানেন, তাঁদের বর্ণনার সঙ্গে আমাদের অনেক চিন্তা হুবহু মিলে যায়। কিন্তু উপন্যাস বা কাহিনী কি কখনো কোনো মানুষের জীবনের চিত্র দিতে পারে?

অথবা উপন্যাসে থাকে এক ধরনের জীবনের আভাস, যা হলেও হতে পারতো, কিন্তু কারুর নয়—কারণ যে ঘটনাসমষ্টি বা পরম্পরা সেখানে কাজ করে—দৈববল ছাড়া অন্য কারুর জীবনে তা একই রকম হওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া লেখার একটা নিজস্ব যুক্তি বা গতি আছে—যার বাইরে যাবার ক্ষমতা লেখকেরও নেই—কিন্তু জীবন অনেক বেশী সুস্থ বা হঠকারী হতে পারে। যেজন্য এমনকি আত্মজীবনীগুলিও প্রকৃত সত্য জীবনী হয়ে ওঠে না কখনো—কারণ ভাষা ও স্টাইল নিজস্ব তথ্যগুলি নির্বাচন করে। বাস্তব ঘটনা ও সংস্থাপনার সামান্য অদলবদলে অন্য চরিত্র পেয়ে যায়।

তবু আমরা উপন্যাসের সঙ্গে নিজের জীবনকে মেলাতে ভালোবাসি। সম্পূর্ণ অজানা পরিবেশ বা অজানা চরিত্ররাশির মধ্যেও পাঠক নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারে। যেসব উপন্যাস পড়ে পাঠকদের শেষ পর্যন্ত মনে হয়, আমি হলে এইরকমই করতুম, বা এই-ঘটনা আমার জীবনে ঘটলেও ঘটতে পারতো—সেইসব উপন্যাস সার্থকতার একটি শর্ত অন্তত পালন করে।

গল্প-উপন্যাসের সমালোচনায় আমরা শুধু দেখি প্লট অথবা চরিত্র নিয়েই বাগবিস্তার। সমালোচক হয়তো এক কলম কিংবা দেড় কলম জায়গা পেয়েছেন, তার মধ্যে পৌনে এক কলমই চলে যায় কাহিনীর বর্ণনায়, এ-ছাড়া এরকম লাইন প্রায়ই দেখা যায় "সাহিত্যের চিরন্তন অ্যালবামে লেখক একটি আশ্চর্য নতুন চরিত্রের সংযোজন করলেন।" উপন্যাসের শেষে কাহিনী কেন ওই জায়গায় থামলো, নায়ক কেন ওইরকম ব্যবহার করলো, নায়িকার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ বা মিলন কেন হলো, অমুক উপ-ঘটনাটা কেন এলো, এ ধরনের অভিযোগও সমালোচককে করতে দেখা যায়। এই সমালোচনার ধরনকে আমার বরাবরই অশিক্ষিত মনে হয়। উপন্যাস একটা আলাদা শিল্পরূপ—কাহিনী কিংবা চরিত্র তার সর্বস্বভূষণ নয়, কাহিনী ও চরিত্র নাটকেও থাকে, এক সময় পেইন্টিং-এও থাকতো, কবিতায় থাকতো, এখনও সিনেমায় থাকে—সুতরাং নিছক এগুলির আলোচনা উপন্যাসের আলোচনা নয়। লেখক কোন রীতিতে লিখেছেন বা কেন এই বইটি লিখেছেন—এই প্রশ্নই সব উপন্যাসের মূল প্রশ্ন। অর্থাৎ বিজ্ঞানের মতনই প্রতিটি উপন্যাসও এক একটি আবিষ্কারের কাহিনী—সে কাহিনী গল্পের মধ্যে নেই, চরিত্রে নেই, থাকে যে গদ্যভাষায় বইটি লেখা সেই গদ্যের সচ্ছল গতিতে এবং দু' লাইনের ফাঁকে সাদা অংশটুকুতেও।

যা-ই হোক, এ সম্পর্কে আমার মতামতের কী-ই বা মূল্য আছে! সুতরাং আমি একজন আধুনিক দিগ্বিজয়ীর মন্তব্য উদ্ধার করছি। ফরাসী আধুনিক সাহিত্যিকদের অন্যতম দিক্‌পাল অ্যালাঁ রুব-

গ্রিয়ে-র নতুন বই স্ন্যাপশট্‌স অ্যাণ্ড টুয়ার্ডস আ নিউ নভেল

(Snapshots & Towards A New Novel by Alain Robbe-Grillet, Calder and Boyars, London. 30 Shillings).

বইটির পাতা ওলটাতে ওলটাতে উপন্যাসবিষয়ক কিছু মন্তব্য চোখে পড়লো। খুব যে নতুন কথা বা মূল্যবান কথা তা নয়, কিন্তু বিদেশীদের কথা ভক্তিভরে শোনাই তো আমাদের অভ্যেস, তাই 'স্নব-মূল্য' বাড়াবার জন্যে আমি তাঁর মতামত এখানে উপস্থিত করছি।

চরিত্র সম্পর্কে হ্রব-গ্রিয়ে বলেছেন, "আপনার কি মনে হয় না, 'চরিত্র' সম্পর্কে আমাদের যথেষ্টেরও বেশী শোনা হয়ে গেছে? কিন্তু হায়, তবু যেন মনে হয় তার সম্বন্ধে শেষ কথা শুনতে আমাদের অনেক বাকি আছে! গত পঞ্চাশ বছর ধরে সে ধুঁকছে, তার মৃত্যুর কথা বারংবার ঘোষণা করে দিয়েছেন নির্ভরযোগ্য প্রাবন্ধিকরা—তবু উনবিংশ শতাব্দীর গৌরবজনক মঞ্চ থেকে তাদের কেউ সরাতে পারে নি। ···এখনও 'প্রকৃত' ঔপন্যাসিকের সংজ্ঞা এই, 'তিনি চরিত্র তৈরী করতে জানেন'···

"যুক্তিও সেই পুরোনো। বালজাক দিয়েছেন আমাদের বুড়ো গোরিও-র চরিত্র, ডস্টএভস্কি জন্ম দিয়েছেন কারামাজোভ ভাইদের—সুতরাং উপন্যাস লেখা মানেই সাহিত্যের ঐতিহাসিক প্রতিকৃতির গ্যালারিতে কয়েকটি আধুনিক চরিত্র তৈরী করে যাওয়া।

"চরিত্র কাকে বলে সবাই জানেন। ইনি শুধু যে-কেউ বা যে-কোনো 'সে' নয়। তার নাম থাকবে—দু'টো নাম, অর্থাৎ ডাকনাম পদবী, বাবা-মা, বংশপরিচয়। তার একটা জীবিকাও থাকে। কিছু বিষয়-সম্পত্তির মালিকানাও মন্দ নয়। এবং তা ছাড়াও সেই চরিত্রটির আবার একটা নিজস্ব 'চরিত্র' থাকবে—তার মুখে যা প্রতিফলিত, তার অতীত যা গড়ে তুলেছে। তার সেই সেই চরিত্র

অনুযায়ীই পাঠক তাকে বিচার করবে, ভালোবাসবে, কিংবা ঘৃণা করবে।

"...তার মধ্যে এমন কতকগুলো বিশেষত্ব থাকবে যাতে সে অনন্য হয়ে ওঠে—এবং এমন সাধারণ উপাদানও দরকার—যাতে সে হয় সার্বজনীন।...

"আধুনিক কালের মহৎ উপন্যাসগুলির কোনোটাই সমালোচনার এই সব শর্ত মানে না। 'লা নোসে' (সার্ত্র-এর বিখ্যাত বড়গল্প) কিংবা দি আউটসাইডার (কামু)-এর বক্তার নাম ক'জন পাঠকের মনে আছে? এই বইগুলোকে চরিত্রের স্টাডি হিসেবে গণ্য করা কি অবাস্তব উদ্ভট কল্পনা নয়? কিংবা 'রাত্রির শেষ পর্যন্ত যাত্রা' (সিলিন)—কি কোনো চরিত্রের বর্ণনা করছে? লোকে কি ভাবে এই তিনখানি বই নেহাত আকস্মিকভাবেই উত্তমপুরুষে লেখা? বেকেট তাঁর নায়কের নাম ও বর্ণনা—একই গল্পের মাঝখানে বদলে দেন। ফকনার ইচ্ছে করেই এক গল্পে দু'জন লোকের একই নাম রাখেন। কাফকা-র দুর্গ বইটিতে নায়কের নাম K, শুধু এই একটি অক্ষরই যথেষ্ট মনে করেছেন তিনি, তার কোনো উত্তরাধিকার নেই, কোনো পরিবার নেই, মুখও নেই।"

উদাহরণ আরও বাড়ানো যায়। (আরও আগে ডস্টএভস্কির নোটস্ ফ্রম দি আণ্ডারগ্রাউণ্ড-এর মুখ্য চরিত্রের নাম বা চেহারা স্মৃতির পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। বস্তুত, আজকাল অধিকাংশ আধুনিক উপন্যাসই উত্তমপুরুষে 'আমি' দিয়ে লেখা হয়—মূল চরিত্রের আকৃতি বা বংশপরিচয় অবান্তর। নামের ঝামেলা এড়াবার জন্য লেখকের নিজের নামটিই সবক্ষেত্রে ব্যবহার করা সুবিধাজনক। আমাদের বাংলায়, 'বিবর' একটি আলোড়নকারী বই—কিন্তু তার নায়কের নাম-ধামের চেয়ে বাসনা ও ব্যবহারই প্রধান। গৌরকিশোর ঘোষ শুধু বলেছেন 'লোকটা'।)

যে-সমস্ত উপন্যাস প্রথাগতভাবে 'চরিত্র' কোটায়, তারা চমৎকা:-

ভাবে পুরোনো উপন্যাসের ধারাতেই খাপ খায়। গত শতাব্দী পর্যন্ত যে যুগ—তা ছিল ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠারই যুগ। প্রগতি বলা যাক বা না যাক, এ কথা মানতেই হবে, এ যুগ শ্রেণীবদ্ধ সংখ্যারই যুগ। কয়েকটি ব্যক্তি বা কয়েকটি পরিবারের উত্থান-পতনের সঙ্গে পৃথিবীর ভাগ্য জড়িয়ে নেই। পারিবারিক পরিচিতি কিংবা ব্যক্তিগতভাবে অসাধারণ গুণসম্পন্ন হওয়া সেই যুগেই দরকার ছিল—যে যুগে প্রতিষ্ঠার জন্য এগুলোই ছিল প্রধানত জরুরী। আমাদের দেশে, ভাল্‌গার অর্থে প্রতিষ্ঠার জন্য এসবের কিছু কিছু প্রয়োজন এখন থাকলেও—সাধারণভাবে বলা যায়, এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের প্রত্যক্ষ তফাত খুব বেশী নেই। একজন মানুষই সর্বশক্তিমান হবে—এ ধারণা এখন আর কেউ করে না—একাকী ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়—হাতাহাতি যুদ্ধের পর বীরত্বের সম্মানের মতনই তা এখন লুপ্ত, এবং লুপ্ত বলেই ভিতরে ভিতরে ক্ষোভময় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এত বেড়েছে। এ শতাব্দীর গোড়া থেকেই উপন্যাস তার প্রধান অবলম্বন 'হীরো'কে হারিয়েছে, সেজন্য দুঃখ করে বা পুরোনো পথে ফিরে গিয়ে নকল হীরো তৈরী করার চেষ্টা অর্থহীন। উপন্যাস এখন শুধু গহনলোকের আবিষ্কারের বর্ণনা।

ধরা যাক আমি একজন অসমীয়া, আমার জন্ম ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়, আমার পিতারও জন্ম এই রাজ্যেই। আমাদের পূর্ব পুরুষ কোথা থেকে এসেছে সে-সম্পর্কে আমার স্পষ্ট ধারণা নেই; কিন্তু আমি এই রাজ্যের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদের জন্য গর্বিত। আমার মাতৃভাষা অসমীয়া—এই ভাষাকে আমি ভালোবাসি। শৈশব থেকেই আমি দেখছি যে নানারকম পার্বত্য জাতি যে-রকম, সেইরকম বহু বাঙালীও এ-রাজ্যের অধিবাসী।

স্কুলে কলেজে বাঙালীদের সংস্পর্শে আমাকে আসতে হয়। বাংলাভাষা আমি মোটামুটি বুঝি। ভালো করে শুনলে, বাংলা ভাষার সঙ্গে আমাদের ভাষার তফাৎ খুব একটা বেশী নেই। আমার সাহিত্যে উৎসাহ আছে বলে আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা পড়ার জন্য বাংলা অক্ষর পড়তে শিখে নিয়েছি—তেমন অসুবিধা হয়নি।

আমি কয়েকবার কলকাতা শহরে বেড়াতে গেছি, নানাসূত্রে বাঙালীদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, আমার কয়েকজন বাঙালী বন্ধুবান্ধবও আছে। কিন্তু মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে আমি বাঙালীদের তেমন পছন্দ করি না। বাঙালীদের মধ্যে এমন একটা হামবড়াই ভাব আছে—যেটা আমার খুব খারাপ লাগে। বাঙালীরা মনে করে তারা সবদিক থেকে শ্রেষ্ঠ—অথচ নিজেদের রাজ্যে সমস্যার অন্ত নেই। আমরা উৎসাহ করে বাংলা সাহিত্য পড়ি, অথচ ওরা অসমীয়া সাহিত্য পড়ে দেখারও চেষ্টা করে না। যে বাঙালীর ছেলেটা সাহিত্য কিছুই বোঝে না, সেও বলে, আমাদের রবীন্দ্রনাথ আছে, শরৎচন্দ্র আছে—আমাদের আর অন্য কিছু পড়ার দরকার

কী? যেন রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র ধুয়েই ওরা সারাজীবন জল খাবে। আসামে বহুদিন ধরে আছে—এমন বাঙালীদেরও এমন মনোভাব। প্রথম প্রথম সহ্য করা যায়—পরে ভালো লাগে না। অসমীয়তে গভ সাহিত্য যে কত প্রাচীন ও সম্পদশালী, সে খোঁজও ওরা রাখা দরকার মনে করে না।

বাঙালীরা আগে-ভাগে ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে বলে ওদের মধ্যে লেখাপড়ার চল বেশী। বিশেষত প্রবাসী বাঙালী পরিবারের সবাই প্রায় শিক্ষিত। এইজন্যই এখানকার চাকরির বাজারে এরা একটা বড় দাবিদার। স্বাধীনতার পর থেকে বাঙালীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে, অনেক চাকরিও এখন তাদের দখলে। এদিকে আসামের ছেলেরাও শিক্ষিত হয়ে বেকার থাকছে। এখানে আসামের ছেলেরা বেকার থাকবে আর বাঙালীরা চাকরি করবে—এ নিয়ে মনের মধ্যে একটা জ্বালা বোধ করি। বাঙালীদের নিজের রাজ্যে ব্যবসা তাদের হাতছাড়া, কিন্তু এই রাজ্যে অনেক ব্যবসায় তারা বেশ সার্থক। অবশ্য গুজরাতি, পাঞ্জাবীরাও আছে।

ধরা যাক, লেখাপড়া শিখে আমি গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেয়েছি। কাউনসিলের মিটিং-এ আমিও উপস্থিত ছিলাম। সিদ্ধান্ত হয়ে গেল অসমীয়া ভাষাই হবে সারা রাজ্যের একমাত্র শিক্ষার মাধ্যম—ইংরেজী আর মাত্র দশ বছর থাকবে। আমিও এতে সায় দিয়েছি। কেননা, কোঠারি কমিশনে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের কথাই তো স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। যদিও মনে মনে জানি, আমরা ভাবের ঘরে একটু কারচুপি করছি—কিন্তু বাইরে সে-কথা বলবো না। মেঘালয়, অরুণাচল ইত্যাদি চলে যাবার পর আসাম রাজ্যের যেটুকু বাকি আছে, সেখানেও বাঙালী ও অন্য ভাষাভাষীর সংখ্যা শতকরা চল্লিশের বেশী। নতুন সেনসাস রিপোরট না বেরুলেও আমরা সবাই এটা জানি, প্রকাশ্যে স্বীকার করি না। শতকরা ছেচল্লিশ ভাগ লোক যদি বাকি লোকদের ওপর নিজের ভাষাটা

চাপিয়ে দেয়—সেটা আর যা-ই হোক, গণতন্ত্র নয়। কিন্তু গণতন্ত্রের ব্যভিচার তো দেশে অনেকভাবেই হচ্ছে। এটা আমাদের করা দরকার, কারণ, অসমীয়াই একমাত্র শিক্ষার বাহন হলে অন্য ভাষার ছেলেরা একটু পিছিয়ে যাবে কিংবা এ রাজ্য ছেড়ে পালাবে—তাতেই আমাদের সুবিধে। চাকরিবাকরিতে আমাদের তখন একাধিপত্য থাকবে—বাঙালীদের রোয়াব আর চলবে না।

প্রথম যেদিন দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঁধলো, সেদিন আমার মনে একটু খটকা লাগলো। মারামারি ঠিক নয়, ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় চুকে যাওয়া উচিত ছিল। খুনোখুনি বড় বিশ্রী ব্যাপার। যখন আমি ছোট ছিলাম, তখন শুনেছিলাম বটে, শিলচরের বাঙালীদের কি-একটা দাবির জন্য দশ-এগারোজনকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছিল। কাছাড় জেলাটা বাঙালীতে গিসগিস করছে—ওরা এমন ভাব দেখায় যেন এ দেশটা ওদেরই।

এ দেশটা আসলে কাদের? যতদিন এ-রাজ্যের নাম আসাম ততদিন এ-রাজ্য আমাদের—এ সম্পর্কে আমরা কারুর তোয়াক্কা রাখি না। কিন্তু অসমীয়া বলতে কাদের বোঝাবে? যাদের জন্ম এখানে, লেখাপড়া শিখেছে এখানে—অথচ বাপ মা বাঙালী—তাদের কী বলবো? বংশের ঠিকুজী কুষ্ঠি খুঁজতে গেলে তো আমাদেরও অনেক কিছুই বেরিয়ে পড়বে। প্রশ্নটা তাহলে ভাষার। আমরা যে কোনো উপায়ে অসমীয়া ভাষা সবাইকে গ্রহণ করাতে চাই। যদি স্বেচ্ছায় না চায়, জোর করে। তাহলে, আমরা কী হীনমন্যতায় ভুগছি? বাঙালীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারবো না —এই ভেবেই কি আমরা এই ব্যবস্থা নিচ্ছি। নইলে, ওরা যদি বাংলায় লেখাপড়া শেখে, আর আমরা অসমীয়ায়—তাহলে কার কী ক্ষতি? কিংবা ওঁদের অসমীয়া শিখতে বাধ্য করা হোক, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষা হোক যার-যার মাতৃভাষায়—তাতে কী আপত্তি? একথা কি ঠিক, আসাম সাহিত্য পরিষদ একবার

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বাদ দিয়ে একটি অসমীয় গানকে আলাদা-ভাবে আসামের জাতীয় সঙ্গীত করতে চেয়েছিল? তার কারণ কি এই যে, ভারতের জাতীয় সঙ্গীত একজন বাঙালীর লেখা এবং তার মধ্যে আসামের নাম নেই? কিন্তু এটা তো অত্যন্ত স্থূল রুচির পরিচয়।

আমি আমার মাতৃভাষাকে ভালোবাসি। আমার মাতৃভাষাকে আমি অন্য কারুর ভাষার চেয়ে ছোট মনে করি না এবং এইজন্য আমি গর্বিত। কিন্তু অন্যের মাতৃভাষার মুখ চাপার চেষ্টায় সায় দিয়েছি বলে আজ আমার অনুতাপ হয়। বিশেষত যে প্রয়াস দাঙ্গা হাঙ্গামায় রূপ নিয়েছে। ভাষার প্রশ্নে মানুষ খুন, বাড়িতে আগুন? কাছাড়, ত্রিপুরা, পশ্চিম বাংলার বাঙালীরা যদি ক্ষেপে ওঠে তাহলে দাঙ্গা হাঙ্গামা আরও ব্যাপক হবে। এ কোন সর্বনাশা পথ, আসামের বিভিন্ন জেলায় দাঙ্গা ও কারফিউ-এর খবর কানে আসে, আর আমার মনে হয়, এটা ঠিক পথ নয়। এই জেদ আমাদের সকলেরই পক্ষে অশুভ।

*　　*　　*

আমি অসমীয় নই। আমি বাংলা ভাষার লেখক। আসামের সাম্প্রতিক ঘটনা আমাকেও স্পর্শ করে। ইতিমধ্যে অনেকগুলি চিঠি এসেছে আমার কাছে—অনেক মর্মন্তুদ ঘটনায় পূর্ণ—কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন—এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি কোনো মন্তব্য করছি না কেন। আমার মন্তব্য করার কোনো অধিকার নেই—কারণ এটা সাহিত্যের প্রশ্ন নয়—এমনকি, আমার মনে হয়, ভাষারও প্রশ্ন নয়—ব্যাপরটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। ভাষার সৃষ্টিই হয়েছে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের জন্য—এ-সম্পর্কে কোনো বিরোধের সৃষ্টি হলে ভাষার সাহায্যেই অর্থাৎ মৌখিক বা লিখিত আলোচনায় মিটিয়ে নেওয়া যেতে পারতো—কিন্তু যখনই মুখ ছেড়ে হাতাহাতির পর্যায়ে আসে, তখনই সেটা ভাষা ছেড়ে রাজনীতির

এলাকায় প্রবেশ করে। গুণ্ডারা আসরে নেমে পড়ে। এইসব রাজনৈতিক চোরাকারবার থেকে আমি দূরে থাকতে চাই।

আমার কিছু অসমীয়া বন্ধু আছে, এ-ভাষার কয়েকজন বিশিষ্ট লেখককেও দেখেছি চিন্তার সূক্ষ্মতায় এবং মানসিক উদারতায় তাঁরা আমার শ্রদ্ধেয়। আমি নিশ্চিত জানি, এইসব ঘটনায় তাঁরা দুঃখ পাচ্ছেন। আমিও দুঃখিত। তবে এই উন্মত্ততা থামাবার ক্ষমতা আছে একমাত্র রাজনৈতিক নেতাদের।

পূর্ণিয়া শহরের ভাট্টা বাজারে বাস থেকে নেমেই মনে পড়লো সতীনাথ ভাদুড়ীর কথা। আমার কাছে পূর্ণিয়া শহরের সঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ীর নামের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। কাছেই একটি পেট্রোল পাম্প ও বেশ বড় আকারের মনোহারী দোকান। দোকানের পরিচালকরা বঙ্গভাষী। সেখানে ঢুকে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, সতীনাথ ভাদুড়ীর বাড়িটা কোথায় ছিল বলতে পারেন?

ভদ্রলোক আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, কাকে খুঁজছেন?

আমি পুনশ্চ সতীনাথ ভাদুড়ীর নাম বললাম। তিনি ঠিক চিনতে পারলেন না, কিংবা ঐ নামটা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। দোকানের অপর একজন পরিচালককে উদ্দেশ্য করে বললেন, এই, ভাখো তো এই ভদ্রলোক কাকে খুঁজছেন?

দ্বিতীয় ব্যক্তিটির কাছে গিয়ে আমার প্রশ্নটির পুনরুক্তি করলাম। তিনি দু' এক পলক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আপনি কার বাড়ি খুঁজছেন? ঠিকানা জানেন?

আমি বললাম, সতীনাথ ভাদুড়ীর বাড়ি, যিনি লেখক ছিলেন।

সাধারণত কোনো সত্যিকারের লেখকের নামের আগে বা পরে, লেখক শব্দ ব্যবহার করতে ইচ্ছে করে না। তবু অবস্থা বিপাকে করতেই হয়। সাহিত্য অনেকেই পড়ে না, অনেকেই সাহিত্যিকদের উল্লেখযোগ্য মানুষ মনে করে না। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, পূর্ণিয়া শহরেও বাঙালীদের কাছে সতীনাথ ভাদুড়ীর নাম নিশ্চয়ই পরিচিত হবে, শুধু লেখক হিসেবে নয়, সমাজ সেবক হিসেবেও।

দোকানের সেই পরিচালকদের কাছেও সতীনাথ ভাদুড়ীর নামটা পরিচিত ঠিকই। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর এত বছর বাদে হঠাৎ তার বাড়ির ঠিকানা সম্পর্কে প্রশ্ন শোনার কথাটা খুবই অপ্রত্যাশিত বলেই ধরতে পারছিলেন না।

বুঝতে পেরে বললেন, তিনি তো মারা গেছেন অনেকদিন।

আমি রীপ ভ্যান উইঙ্কল নই যে এ খবর জানবো না। বললাম, আমি ওর বাড়িটা কোথায় ছিল, তা-ই জানতে চাইছি।

কেন, সে বাড়িতে গিয়ে কী করবেন? সেখানে তো কেউ থাকে না।

এবার আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম। সত্যিই তো, সতীনাথ ভাদুড়ির বাড়ির খোঁজ করছি কেন? কী হবে সেখানে গিয়ে? আমরা নিজেদের অনেক গতিবিধির মানে জানি না। সতীনাথ ভাদুড়ীকে আমি কোনোদিন চর্মচক্ষে দেখিনি, তাঁর জীবিত-কালে তাঁর সঙ্গে দেখা করার কোনো ইচ্ছে আমার হয়নি। এখন তাঁর বাড়িতে কেন যেতে চাই?

একটা ছুতো খুঁজে পেয়ে গেলাম। সতীনাথ ভাদুড়ীর নানা লেখায় তাঁর বাড়ির বাগানের উল্লেখ আছে। বাগান করা তাঁর প্রিয় ব্যসন ছিল। সহকারের সঙ্গে মাধবীলতা মেলাবার সেই বিখ্যাত কৌতুক বললাম, ওঁর বাগানটা দেখতে চাই, খুব নাকি ভালো বাগান—

সে বাড়ি বিক্রী হয়ে গেছে। সেসব বাগান টাগান আর···। ভদ্রলোকের গলায় আফসোসের সুর ছিল। স্থানীয় লোকদের উদ্যোগে বাড়িটা রক্ষা করার কী সব চেষ্টা হয়েছিল, সে কথাও বললেন। তা সত্ত্বেও আমি বাড়িটা দেখতে গিয়েছিলাম। বছর কয়েক আগের কথা, তখন বাড়টার সদর ছিল তালাবন্ধ, গেটের সামনে আগাছা। এখন কী অবস্থা জানি না।

লেখকদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করা কিংবা মৃত লেখকের বাড়ির

বাগান দেখতে যাওয়া আমার স্বভাবের অন্তর্গত নয়। কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ী সম্পর্কে আমার দুর্বলতা অত্যধিক। বিশেষত যত দিন যাচ্ছে ততই বাংলা ভাষার পাঠকদের মধ্যে সতীনাথ ভাদুড়ী সম্পর্কে বিস্মরণ এসে যাচ্ছে বলে আরও বেদনা বোধ করি। ইদানীংকালের অনেক নবীন পাঠক এঁর নামও শোনেননি, এঁর অনেক বই এখন ছাপা নেই। এই লেখকের স্মৃতিরক্ষার কোনো ব্যবস্থা হবে না। সতীনাথ ভাদুড়ী জীবিতকালে কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় ঘোরাঘুরি করেন নি কখনো, কাগজের সম্পাদকদের সঙ্গে দেখাশুনা করেননি বিশেষ, প্রায় সমস্ত লেখাই ডাকে পাঠাতেন। কোনোদিন সেরকম কোনো সভাসমিতিতে যাননি। তিনি শুধু লিখতেন। এবং তাঁর লেখার সঙ্গে অর্থোপার্জনের সম্পর্কটাও ছিল অপ্রত্যক্ষ। এবং এরকম লেখক বাংলা ভাষায় খুব বেশী জন্মাননি। প্রথম বইটিতেই তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর পরের বইগুলিও ভারতবর্ষের সব ক'টি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। যদি পুরস্কার অর্থে স্বীকৃতি ও সম্মান বোঝায়। সতীনাথ প্রত্যেকটি বই লিখতেন নতুন পরিকল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। এবং এই একজন বিরলজাতের লেখক যিনি নিজেকে সম্পূর্ণ গোপন করে রাখতে পেরেছেন নিজের রচনা থেকে।

তাঁর যে-কোনো বই পড়লেই বোঝা যায়, কী অসম্ভব শক্ত এই ধরনের বই লেখা। তাঁর রচনার গতি কোথাও দুর্বার নয়, বিন্দু বিন্দু রস চয়ন করে মৌচাক সৃষ্টির মতন। জাগরী ছাড়া তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই আমার কাছে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' দুই খণ্ড, 'অচিন রাগিণী' 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' 'জলভ্রমি' এবং 'সঙ্কট'। ঢোঁড়াই চরিত মানসের কথা আমি বারবার নানা জায়গায় উল্লেখ করেছি। এরকম বিস্ময়কর বই যে-কোনো দেশের সাহিত্যে দুর্লভ। এই বইখানি বাংলার আধুনিক ক্লাসিক হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য। রিক্ত সর্বহারাদের নিয়ে বাংলায় কিছুই লেখা হয়নি এই

অভিযোগ যাঁরা করেন তাঁরা অনেকেই অবশ্য ঢোঁড়াই চরিত মানস পড়েননি। পড়লেও বোধহয় পছন্দ হবে না, কারণ বইখানি শেষ পর্যন্ত শান্ত রসের। বস্তীবাসীর জোলো প্রেম কাহিনী যেমন এটা নয় তেমনি এতে দাঙ্গাহাঙ্গামার দিকটাও বড় করে দেখানো হয়নি। *নিদারুণ অর্থনৈতিক নিষ্পেষণের কথা আছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে* অধ্যাত্মরসে এখনো ভারতের লক্ষ লক্ষ সরল নিম্নবিত্ত মানুষ আশ্রয় ও সান্ত্বনা পেতে চায় সতীনাথ ভাদুড়ী সেই জীবন-সত্যের কথাই বলেছেন। সাহিত্যের বিচারে বইটি আশ্চর্য সার্থক। বইটি সতীনাথ ভাদুড়ীর নিজেরও খুব প্রিয় ছিল; কারণ অন্য একটি লেখায় তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, এই বইটি পাঠকদের সমাদর পায়নি। যদি পেত তিনি বইটার আবার পরিমার্জন করতেন, আরও একখণ্ড লিখতেন। বাংলা সাহিত্য সেই লেখা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর লেখার কথা ভাবলে বাংলাদেশের এই দুঃসময়ের কথাও মনে পড়ে। মনে হয় সত্যিকারের সৎ ও অকৃত্রিম সাহিত্যের আজ সমাদর নেই। একজন লেখকের মৃত্যুর পরই যদি পাঠকরা তাঁদের ভুলে যায়—হঠাৎ কোনো হুজুগে তাঁদের পুনর্জীবিত করার ব্যবস্থা হলে তাহলে জীবিতকালে কে আর অমরত্বের সাধনায় সাহিত্য রচনা করতে চাইবে? তাৎক্ষণিক হাতে-গরম লেখার যুগই বুঝি কায়েম হয়ে গেল।

আজকাল নানা প্রকাশন-সংস্থা থেকে হঠাৎ এক সঙ্গে অনেক রকম গ্রন্থাবলী ও সংগ্রহ বেরুতে শুরু করেছে। হঠাৎ এক-একটা ঢেউ আসে, এটা একটা নতুন ঢেউ। এখানে প্রকাশক ও ক্রেতার মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তৈরি হচ্ছে বলে বইগুলির দামও বেশ শস্তা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বইগুলি প্রকাশের আগেই গ্রাহকদের আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি বেরোয়, ইচ্ছুক পাঠক বা ক্রেতা সামান্য কিছু টাকা দিয়ে নাম তালিকাভুক্ত করে রাখেন, পরে দফায় দফায় টাকা দিয়ে বই পেয়ে যান। এ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় সব ক'টি গ্রন্থাবলীই বেশ সুদৃশ্য ছাপা, শক্ত বাঁধাই।

এক সঙ্গে অনেকে মিলে একটা কাজ শুরু করলে তা হুজুগের মতন মনে হয়। অনেকে বলছেনও একে হুজুগ। কেউ কেউ মন্তব্য করছেন, এ ঢেউতে দু-দিনেই ভাঁটা পড়বে। ইত্যাদি। আমার মনে হয় অবশ্য, বর্তমান কালের বিভিন্ন প্রকাশকদের এই উদ্যোগটি খুবই অভিনন্দনযোগ্য।

এর পেছনে ব্যবসায়িক অভিসন্ধি কী আছে বা না আছে, তা আমি জানি না। তবে এর ফলে বেশ কিছু দুর্লভ বই যে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আসছে, তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই। একজন প্রকাশক বঙ্গ দর্শনের সমস্ত সংখ্যাগুলির পুনর্মুদ্রণ করছেন। 'বঙ্গ দর্শন' আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের অন্তর্গত। এই সংখ্যাগুলি ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখা তো দূরের কথা, শুধু দেখতে পাবার জন্যই বহু কাঠ-খড় পোড়াতে হয় এখন পর্যন্ত। কিস্তিতে টাকা দিয়ে সেই মহামূল্যবান পত্রিকা সংগ্রহ করা, শুধু গবেষকদেরই নয়, সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই কাছে একটি সৌভাগ্যজনক ঘটনা।

কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের সব ক'টি খণ্ড বহু চেষ্টা করেও আমি আগে জোগাড় করতে পারিনি। একজন উদাসীন ধরনের বন্ধুর কাছ থেকে সেগুলো সব চেয়ে এনে বহুকাল নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলাম—হঠাৎ কী কারণে যেন তার চৈতন্যোদয় হয় এবং বিনা ভূমিকায় আমার বাড়ি থেকে বইগুলি ফেরৎ নিয়ে যায়। কিছু দিন আগে এক সদ্য-তরুণ সাহিত্য যশোপ্রার্থীকে ধমক দিয়ে বলেছিলাম, তুমি কালী সিংহীর মহাভারত পড়োনি, আবার বাংলা সাহিত্য নিয়ে কথা বলতে এসেছো? সে আমায় মুখের মতন জবাব দিয়ে দেয়, কোথায় পাবো যে পড়বো?

যে-সব বই সকলেরই অবশ্য পড়া উচিত অথচ সেগুলো ইচ্ছে হলেও কিনতে পাওয়া যায় না—এটা একটা অদ্ভুত অবস্থা। আগে যে-সব গ্রন্থাবলী পাওয়া যেত বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে, সুলভ মূল্যে—সেগুলি আমাদের অনেক উপকার করেছে বটে, কিন্তু সেগুলির কাগজ ও ছাপা এত খারাপ যে, কহতব্য নয়।

এখানে ওখানে এরকম কয়েকটা অভিযোগ শুনি যে, এই হুজুগে অনেক অপ্রয়োজনীয় বইও বেরুচ্ছে। কিংবা, কোনো-কোনো লেখকের কিছু ভালো লেখা ও অনেক বাজে লেখা আছে—এখন সবগুলোই এক সঙ্গে কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে। এর উত্তরে আমার মনে হয়, কিছু বাজে লেখা দিয়ে ভালো লেখার গুণ ঢাকা যায় না। সব মিলিয়ে বইটি শস্তায় পাওয়া গেলে ঐ দিকটাও পুষিয়ে যায়। তা ছাড়া, অনেক লেখক—যাঁরা মৃত্যুর পরে এমন একটা স্থান পেয়ে যান, তাঁদের ভালো-খারাপ সব লেখাই পড়ে রাখা সাহিত্যবোধের অঙ্গ হয়ে ওঠে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় —যাঁর অনেকগুলো আশ্চর্য ভালো গল্প ও কয়েকটি চিত্তাকর্ষক উপন্যাস আছে—তাঁর অকিঞ্চিৎকর রচনার সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু কেউ যদি কথা প্রসঙ্গে 'ইগনোরেন্ট মানে অজ্ঞান' এই রকম বলে বা লেখে—তা হলে শ্রোতা বা পাঠকের জানা থাকা চাই যে, ওটি

প্রভাত মুখুজ্যের একটি গল্পের থেকে নেওয়া এবং বাংলা সাহিত্যের একটি অমর রসিকতা। কেউ যদি এটা আগে থেকে না জানে, তা হলে তাকে আবার বুঝিয়ে বলা বড় মর্মান্তিক ব্যাপার।

অনেকে ক্ষোভের সঙ্গে বলছেন, এই সব চকচকে সোনার জলে নাম লেখা গ্রন্থাবলীগুলো শৌখিন লোকের সামগ্রী হচ্ছে। তারা সুদৃশ্য কাচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখার জন্য এই সব বই কেনে, পড়বার জন্য নয়।

এরকম যদি হয়ও, তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতি নেই। শুধু দু'চারজন উৎসাহী পাঠকের জন্য প্রকাশকরা কোনোদিনই বই ছাপেন না। যার ইচ্ছে হয়, বাড়িতে বই সাজাক, প্রকৃত পাঠকদের তো তাতে কোনো ক্ষতি নেই। ধনবানে কেনে বই, জ্ঞানবানে পড়ে—এরকম একটা কথা আগে সত্যি ছিল, এখন যদি সেই সব দিন আবার ফিরে আসে, তাতে ক্ষতি কী? এক সময় ফরাসী দেশের অভিজাত পরিবারের মহিলাদের মধ্যে কবিতা নিয়ে আলোচনা করা খুব ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাতে ফরাসী কবিদের উপকারই হয়েছে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'—এর দ্বিতীয় খণ্ড একবারই মাত্র ছাপা হয়েছিল। এই মূল্যবান বইটি শত চেষ্টা করলেও আর পাওয়া যেত না। সম্প্রতি সতীনাথ গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' সমগ্র রচনাটিই পেয়ে গেলাম। অন্তত দশ বারো বছর আগে এই বইটি পড়েছিলাম আমি। সময়ের ব্যবধানে পাঠকের মন অনেক বদলে যায়, আমি নিজেও অনেক বদলে গেছি। বইটি পড়বার আগে আমার নিজের একটু ভয় ছিল, আগেকার মতন ভালো লাগবে তো?

পড়তে আরম্ভ করে আর ছাড়তে পারিনি। মনে হলো যেন সম্পূর্ণ টাটকা কোনো নতুন বই। 'কালজয়ী গ্রন্থ' কথাটা আমরা অনেক সময় আলটপকা ব্যবহার করি, কিন্তু এই সব রচনাকেই প্রকৃতপক্ষে কালজয়ী বলা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, আমি আগে

ঢোঁড়াই চরিত মানস পড়ে যতটা রস পেয়েছিলাম, এবারে পেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশী। এবং এ-বিষয়েও আমার এখন আর কোনো সন্দেহ নেই যে, 'জাগরী'র চেয়েও এই উপন্যাস অনেক বেশী পরিণত রচনা, সতীনাথের জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা। সতীনাথের সারা জীবনের অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়ন ও সাহিত্যিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে এই উপন্যাসে। এটা নিছক একটি উপন্যাসই নয়—এই লেখকের জীবনের একটি ব্রতও এর মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। বোঝা যায়, বাংলা সাহিত্যে তিনি ঠিক কী করতে চেয়েছিলেন। কলকাতা থেকে বেশ দূরবর্তী অঞ্চল নিবাসী একজন লেখককে ঠিক করে নিতেই হয় যে তিনি যা লিখবেন, তা হবে বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন। তিনি তাই-ই করেছিলেন। ঢোঁড়াই চরিত মানসের সঙ্গে তুলনা করা চলে ঠিক এরকম বাংলা উপন্যাস আর একটাও নেই। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তখনকার পাঠকরা এই বইয়ের তেমন সমাদর করেননি। এখনকার পাঠকরা সেই ভুল করবেন কিনা জানি না।

নোবেল ফাউণ্ডেশান ও সুইডিস অ্যাকাদেমির তদারকিতে মাত্র তিন-চার বছর আগে থেকে, এযাবৎ সাহিত্যের জন্য যতগুলি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, তার একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে। অনেকগুলি খণ্ডে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সজ্জিত এই বইগুলি পুস্তক সংগ্রহকারীদের কাছে বিশিষ্ট সম্পদ হিসেবে গণ্য হবার মতন। এতে থাকছে, নোবেল পুরস্কার কমিটি প্রত্যেকটি লেখককে কেন পুরস্কার দিয়েছেন, পুরস্কার দেবার সময় সেই লেখকের কী পরিচয় দেওয়া হয়েছিল এবং উত্তরে লেখকরা কী বলেছিলেন এবং তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও পুরস্কৃত রচনা। এই রকম একটি খণ্ডে আছেন চারজন লেখক, তাঁদের মধ্যে একজন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাকি তিনজন হলেন : ডব্লু বি ইয়েটস, আলেকজান্দ্র সোলঝেনিৎসিন এবং সিগরিড আনডসেন্ট। শেষোক্তজন ডেনমার্কের লেখিকা, পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯২৭ সালে।

রবীন্দ্রনাথের অংশে আছে সুইডিশ অ্যাকাদেমির নোবেল পুরস্কার কমিটির তৎকালীন সভাপতির ভাষণ, ইয়েটস-এর ভূমিকা সহ ইংরেজি গীতাঞ্জলি, ইংরেজি ডাকঘর, অমিয় চক্রবর্তীর লেখা কবির জীবনী এবং পুরস্কার-কাহিনী। আর আমব্রোগিয়ানির আঁকা ছবি।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পটভূমিকা সম্পর্কে 'দেশ' পত্রিকায় কয়েক বছর আগে সৌরীন মিত্র মহাশয় সুদীর্ঘ রচনা লিখেছেন। তিনি প্রায় কিছুই বাকি রাখেননি—তবে পুরস্কার দেবার সময়কার সভাপতির ভাষণটিও তিনি ঠিক সংগ্রহ করেছিলেন কি না মনে করতে পারছি না। এবং পুরস্কারের বিচার-কাহিনী সম্পর্কে

এই কমিটি যে তথ্য দিয়েছেন, তা আমার মতন অনেক সাধারণ পাঠকেরই অজানা।

তখন ইংলণ্ডের লেখকদের নাম পাঠাবার দায়িত্ব ছিল স্টার্জ মুরের ওপর। ইয়েটসের কাছ থেকে গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি দেখে তিনিই রবীন্দ্রনাথের নাম সুপারিশ করেন। সেবারের অন্যতম প্রার্থী টমাস হার্ডি, যাঁর সমর্থনে সাতানব্বই জন বিখ্যাত ব্যক্তির সই করা এক আবেদনপত্র গিয়েছিল। সেবার সাহিত্যের নোবেল পুরস্কারের জন্য মোট ২৮ জন প্রার্থীর নাম ছিল এবং রবীন্দ্রনাথের পুরস্কার পাবার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। অন্যান্য প্রার্থীর মধ্যে ছিলেন ফ্রান্সের পীয়ের লোতি, আনাতোল ফ্রাঁস এবং আনর্স্ট লাভিস্, ইটালির গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা, এবং স্পেনের বেনিতো পেরে গালডোস—যাঁর সমর্থনে সই করেছিলেন সাতশো জন। এঁরা সকলেই আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন, সেই তুলনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেউ না।

সৌভাগ্যের বিষয়, সেই সময় নোবেল কমিটিতে একজন সদস্য ছিলেন যিনি প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্, বাংলা পড়তে পারেন এবং রবীন্দ্রনাথকে আগেই চিনতেন। আর একজন সদস্য, নিজেও কবি, ভেরনার ফন হেইডেনস্টাম গীতাঞ্জলি পড়ে প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং এ-বইয়ের সমর্থনে একটি বিস্তৃত রিপোর্ট লেখেন। কমিটির অন্য সদস্যরা একেবারেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে না, মাত্র দু'জন সদস্য গীতাঞ্জলির স্বপক্ষে পড়ে যেতে লাগলেন, অন্যদের ঐ বই পড়াতে প্রবৃত্ত করলেন। কমিটি, এমনকি, এমিল ফাগে নামের একজন লেখকের নাম আগে সুপারিশ করে ফেলেছিলেন পর্যন্ত, শেষ পর্যন্ত ভোটাভুটিতে তা বাতিল হয়ে যায়। ১৩ নভেম্বর তেরজন সদস্য বিশিষ্ট সেই মিটিং-এ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে পড়ে বারোটি ভোট।

রবীন্দ্রনাথ সেদিন তাঁর শিষ্যদের নিয়ে শান্তিনিকেতনের কাছাকাছি কোনো জঙ্গলে অভিযানে বেরিয়েছিলেন (এঁরা এই কথা লিখেছেন, সত্যি কি না আমি জানি না)—সেখান থেকে ফেরার পথে, সন্ধে হয়ে

এসেছে, গ্রাম্য ডাকঘরের ভেতর থেকে একজন লোক দৌড়ে বেরিয়ে এসে কবির হাতে একটি টেলিগ্রাম দেয়। রবীন্দ্রনাথ সেটি না খুলেই পকেটে রেখে দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু লোকটির পিড়াপিড়িতে তক্ষুনি খুলতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রদের সেটি পড়ে শোনালেন।

আমরা সবাই জানি, পুরস্কার নিতে রবীন্দ্রনাথ স্টকহলমে যান নি। সুইডেনে তিনি গিয়েছিলেন এর আট বছর পরে, এবং রাজ-সমাদর পেয়েছিলেন।

পুরস্কার সভায় সভাপতির ভাষণটি বেশ দীর্ঘ, ছ'পাতা। সেটা সম্পূর্ণ অনুবাদ করার ধৈর্য আমার নেই, আগে কেউ অনুবাদ করেছেন কি না আমি জানি না। সেটা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথকে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কবি বলায় আমাদের কানে খটকা লাগে—যদিও সমগ্র ভাষণটি সুচিন্তিত এবং খুব একটা তথ্যেরও ভুল নেই। যে ভারতীয়রা ইংরেজিতেও লেখেন, তাঁদের তৎকালে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান লেখকই বলা হতো, আজকাল বলা হয়, ইণ্ডো-অ্যাংলিয়ান।

এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথের রচনায় ধর্মীয় চেতনার ওপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ব্রাহ্ম সমাজের কথা এবং তিনি হয়ে উঠেছিলেন এই সমাজের চোখে একজন গুরু এবং 'প্রফেট'। কথাটা সবাই মানবেন কি না জানি না, তবে অবশ্য প্রফেট কথাটার বিভিন্ন অর্থও করা যায়। আর এক জায়গায় বলা হয়েছে, তিনি কিছুদিনের জন্য লেখাটেখা ছেড়ে প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে পবিত্র গঙ্গা নদীর বুকে একটা নৌকোয় ধ্যানী তপস্বীর জীবন কাটিয়েছেন। অর্থাৎ সাহেবরা এই ব্যাপারটা কিছুই বোঝেনি। পদ্মার ওপর বজরায় তিনি ছিলেন একজন বিলাসী জমিদারপুত্র এবং সেই সময়েই লিখেছেন অনেকগুলি চমৎকার কৌতুক ও প্রণয়ের কবিতা, গল্প ও চিঠি—তাঁর রচনার সেটা স্বর্ণযুগ বলা যায়। এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথের

ইংরেজি ভাষাজ্ঞান ও কবিত্বের যেমন যথার্থ এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে, তেমনি বারবার একথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর ধ্যান-ধারণার সঙ্গে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের কোনো বিরোধ নেই। এবং পুরস্কারদাতাদের বিশ্বাস, এই কবির উদ্দেশ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মাঝখানের বিরাট তফাৎ ঘুচিয়ে দিয়ে মিলন ঘটানো।

পুরস্কার কমিটিকে রবীন্দ্রনাথ যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন সেটা আসলে তাঁরই কবিতার দু'টি লাইনের অনুবাদ অথবা ঐ ভাব নিয়ে। পরে তিনি লিখেছিলেন, 'দূরকে করিলে নিকট বন্ধু পরকে করিলে ভাই।' টেলিগ্রামটির বয়ান—

'I beg to convey to the Swedish Academy my grateful appreciation of the breadth of understanding which has brought the distant near, and has made a stranger a brother.'

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এই শতাব্দীর সমান-বয়সী। কবিতায় তিনি নিজেই সেই দাবি করেছেন। তাঁর জন্ম ১৯০১ সালে। এই শতাব্দীর সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি বড় হয়ে উঠেছেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু উনিশ শো ষাট সালে। যদিও তাঁর চরিত্রে, গত শতাব্দী সুলভ অনেকগুলি গুণের সংমিশ্রণ দেখা গিয়েছিল।

একটি প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন যে, সুধীন্দ্রনাথের মতন বহু গুণ সমন্বিত পুরুষ শুধুমাত্র বাংলা কবিতায় কেন মনঃসংযোগ করেছিলেন। "সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ও মনস্বী, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী বুদ্ধির অধিকারী, তথ্যে ও তত্ত্বে আসক্ত, দর্শনে ও সংলগ্ন শাস্ত্রসমূহে বিদ্বান; তাঁর পঠনের পরিধি ছিলো বিরাট ও বোধের ক্ষিপ্রতা ছিলো অসামান্য। সেই সঙ্গে যাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান, সাংসারিক ও সামাজিক সুবুদ্ধি তা'ও পূর্ণমাত্রায় ছিলো তাঁর...।" সুতরাং বুদ্ধদেব বসুর এ-প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক।

বাংলা কবিতার চেয়েও কোনো বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পাবার আগ্রহ সুধীন্দ্রনাথ কখনো বিশেষ দেখাননি। উত্তর কলকাতায় প্রখ্যাত ধনী পরিবারের সন্তান—তাঁর পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত একদিকে যেমন ছিলেন খ্যাতনামা পণ্ডিত—অন্যদিকে সামাজিক দিক থেকেও উচ্চ-প্রতিষ্ঠিত। পৈতৃক পেশার জন্য আইন শিক্ষা শুরু করেও সুধীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ করেননি, এম এ পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসুর ফরোয়ার্ড পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েও বেশী দিন থাকতে পারেননি, কিছু দিনের জন্য বীমা ব্যবসাও করতে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত এইসব ছেড়ে—সুধীন্দ্রনাথ নিজেকে নিমগ্ন করেছিলেন পূর্ণ মানুষ হবার সাধনায়।

আমি সুধীন্দ্রনাথকে সর্বসমেত তিনবার দেখেছি। তৃতীয়বারের দেখাটাই দীর্ঘ কালব্যাপী হয়েছিল, তখন তিনি মৃত, খবর পেয়ে সকালবেলাই গিয়েছিলাম—আকস্মিক মৃত্যু বলে তাঁর শরীরে কোনো মালিন্যের স্পর্শ লাগেনি—অন্য অনেকের সঙ্গে আমিও তাঁর শবযাত্রায় কাঁধ দিয়েছিলাম। বাঙালীদের মধ্যে অমন সুপুরুষ কদাচিৎ দেখা যায়। তাঁর বৈদগ্ধ্য তাঁকে গাম্ভীর্য দেয়নি, সুরসিক ও ও অতিশয় রুচিসম্পন্ন মানুষ, উদার ও স্নিগ্ধভাষী—একটু বেশী সাহেবী-আনা শুধু চোখে লেগেছিল। মধ্য কলকাতার তাঁর বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে প্রথমবার দেখা করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছিল—সমাজের এই প্রকার মানুষের সঙ্গে আমার যোগাযোগের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, যদি না এঁর বাংলা কবিতা বিষয়ে দুর্বলতা থাকতো এবং তিনি লেখক বলেই আমাদের সমশ্রেণীর।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতা-রচনার ইতিহাসে যথেষ্ট কৌতূহলের উপাদান আছে। বুদ্ধদেব বসু পরিবেশিত তথ্য থেকে মনে হয়—রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও প্রেরণাই এক অকিঞ্চিৎকর পদ্য লেখককে বিশিষ্ট কবিতে রূপান্তরিত করেছে।

প্রথম যৌবন পর্যন্ত সুধীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার সঙ্গে তেমন পরিচিত ছিলেন না। কৈশোরে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল কাশীতে অ্যানি বেসান্ত স্থাপিত বিদ্যালয়ে। সেখানে তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজি শিখতেন—বাংলা ভাষার প্রতি তেমন পরিচয়ের সুযোগ ঘটেনি। ছুটিতে বাড়ি ফিরে তিনি মায়ের সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলতেন। তাঁর সর্বপ্রথম বাংলা কবিতা রচনার প্রচেষ্টা দেখা যায় একুশ বছর বয়সে—একটি চটি খাতার ওপরে লেখা 'শ্রীশ্রীদুর্গামাতা সহায়'—ভিতরে বানান ভুলে কণ্টকিত যুবক কবির পদ্য। শ্রীশ্রীদুর্গামাতার আর যত শক্তিই থাক—কবিতা রচনার ক্ষেত্রে কতটা সহায়তা করতে পারেন—সে ব্যাপারে ঘোর সন্দেহ আছে। সুধীন্দ্রনাথের তৎকালীন সমস্ত রচনাই পাতে দেবার অযোগ্য। স্মরণ করা যেতে পারে ঐ বয়সে

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির পরিমাণ। প্রায় ঐ বয়েসেই বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র বহু-আলোচিত কবি, নজরুল ইসলাম ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় শ্রুতকীর্তি।

সুধীন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। প্রতিভা বলতে পরিশ্রমকে বাদ দেওয়া বোঝেননি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনেছেন বাংলা শব্দের গঠন ও ছন্দ। দেরি করে যিনি বাংলা শিখতে শুরু করেছিলেন উত্তরকালে তিনিই বাংলা ধ্বনি ও শব্দতত্ত্ব বিষয়ে পণ্ডিত বলে প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন। এককালে যিনি দুর্গা সহায় করেছিলেন, পরবর্তী জীবনে তিনি নাস্তিক ও জড়বাদী হয়েছিলেন।

সুধীন্দ্রনাথের হাতে সত্যিকারের কবিতার জন্ম হয় রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে এসে। ১৯২৯ সালে তিনি প্রথমবার বিদেশে যান, রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি হিসেবে সঙ্গী ছিলেন কিছুদিন। সেই সময় জাহাজে প্রতিদিনই তিনি কিছু না কিছু লিখতেন—এই যাত্রাতেই তিনি রচনা করেন প্রথম সার্থক কবিতা—পরবর্তীকালে যা 'অর্কেস্ট্রা'য় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে এসেও সুধীন্দ্রনাথ ফাঁদে পা দেননি, মিশে যাননি রবীন্দ্রানুরাগী কবিবৃন্দের দলে, নুনের পুতুল হয়ে গলে যাননি সাগরে। তাঁর স্বকীয়তা, তাঁর নিঃশংসয় কবিসত্তা চিনে নিতে কারুর ভুল হয়নি।

বিদেশ থেকে ফিরেই তিনি প্রবলভাবে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। প্রকাশ করেন 'পরিচয়' পত্রিকা, তাঁদের কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের পুতুল-বসানো বাড়িতে বসতো কলকাতার শ্রেষ্ঠ বিদগ্ধ ব্যক্তিদের আড্ডা—সুধীন্দ্রনাথ নিজস্ব কবিতা, অনুবাদ ও প্রবন্ধ রচনায় মেতে ওঠেন। তারই ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি অর্কেস্ট্রা, ক্রন্দসী, উত্তর ফাল্গুনী, দশমী, সংবর্ত আর স্বগত এবং কুলায় ও কালপুরুষ।

সুধীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় একজন প্রধান কবি। কিন্তু তাঁর কবিতা সহজপাঠ্য নয়। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, "সুধীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ।" একথা ঠিকই—অপ্রচলিত শব্দগুলির অর্থ জানা থাকলে তাঁর সমগ্র কবিতার ভাব বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না। জীবনানন্দের মতন আপাত সরল কিন্তু ব্যাখ্যার অতীত পংক্তি তিনি রচনা করেননি। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা বোঝার জন্য বুদ্ধদেব বসু অভিধান অভ্যাস করার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু কবিতা পাঠের সময় অভিধান দেখা বা না-দেখা কোনো বড় প্রশ্ন নয়। প্রকৃত আভিধানিক অর্থে কিছু কিছু শব্দ কবিতায় ব্যবহার করার যুক্তি আছে কি না সেটাই প্রশ্ন। শব্দের মূল্য কোথায়—তার অর্থে না ব্যবহারে? বেশীর ভাগ সময় অপ্রত্যাশিত, অনভিপ্রেত, এমনকি অনধিকারী শব্দও সঠিক সংস্থাপনের জন্য কবিতায় ঝলমল করে ওঠে না? জীবনানন্দ যেভাবে 'এক মাইল শান্তিকল্যাণ' লিখেছিলেন। কবিতায় শব্দার্থের চেয়ে ব্যাঞ্জনার দিকেই কি ঝোঁক বেশী নয়?

জেমস জয়েস বিষয়ে এরকম একটা কথা প্রচলিত আছে যে, তাঁর দৃষ্টিশক্তি খুব খারাপ ছিল বলেই তিনি দৃশ্য-সৌন্দর্যের বদলে শব্দ-ঝঙ্কারের দিকে ঝুঁকেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথেরও ঝংকারবহুল শব্দপ্রীতি দেখে মনে হয়—এর কারণ এই হতে পারে যে, বাংলা শব্দ সম্পর্কে তাঁর বাল্যস্মৃতি ছিল না। মাইকেল মধুসূদনেরও ঐরূপ শব্দ ব্যবহারেরর কারণও এক। যত্নে আয়ত্ত করা ভাষা অভিধান-নির্ভর হয়।

আমি সুধীন্দ্রনাথকে একদিন কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কবিতায় এত আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করেন কেন। তিনি বেশ খানিকটা জোর দিয়ে বলেছিলেন, ইয়াংম্যান, উই হ্যাড টু বি ডিফরেন্ট। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আলাদা হবার জন্য ঐ পন্থা তিনি নিয়েছিলেন ইচ্ছে করে। তিনি ভুল করেছিলেন, এতে কোনো

সন্দেহ নেই। তাঁরই সমসাময়িক অপর কবি, জীবনানন্দ দাশ,—সুধীন্দ্রনাথ যাঁকে কবি বলেই স্বীকার করতে চাইতেন না—আনুষ্ঠানিকভাবে রবীন্দ্র-বিরোধী না হয়েও যাবতীয় কথ্য ও গ্রাম্য শব্দের অভূতপূর্ব ব্যবহারে বাংলা কবিতাকে একেবারে বদলে দিয়েছিলেন।

সুধীন্দ্রনাথের ঝংকারবহুল কবিতা এখন আমাদের কাছে কিছুটা কৃত্রিম লাগে। কখনও কখনও পড়তে ভালো লাগলেও প্রাণে স্পর্শ করে না। মনে থেকে যায় তাঁর সেই বিরল সংখ্যক পংক্তি— যেখানে তিনি সরল ও আন্তরিক। যেমন,

"সেদিনও এমনই ফসল বিলাসী হাওয়া
মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে :
অনাদি যুগের যত চাওয়া যত পাওয়া
খুঁজেছিল তার আনত দিঠির মানে।
একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করে ছিল সাতটি অমরাবতী..."

এই তুলনায় তাঁর পরোক্ষ বর্ণনাভঙ্গী যেন ঠিক তারটি স্পর্শ করে না। যেমন,

আমাদেরই দুর্মর অতীত
অতর্কিত ভূকম্পনে বিনাশিতে বিলাসের ভিত ;
প্রেতাকুল ব্যবধানে সঞ্জীবনী বাহুর নিবীত
ছিন্ন, ভিন্ন হবে অনুক্ষণ ;
অহৈতুক অপব্যয়, অনুচিত অর্চনায় লাভ
আস্ফালিতে স্তব্ধ দুঃস্বপন।

এখানে দু-একটি শব্দের অর্থ অজানা থাকলেও অভিধান দেখার

জন্য বাসনা জাগায় না। সাম্প্রতিক কবিতার ঝোঁকই যে কথ্য ও মুখে প্রচলিত শব্দের দিকে—অর্থাৎ প্রতিনিয়ত জীবনকে জড়িয়ে নেওয়ায়—এটা তিনি ধরতে পারেননি। এই কারণেই তাঁর গদ্য রচনাগুলিও অপাঠ্য। 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যায় মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর সুন্দর চিঠিগুলিই ব্যতিক্রম।

সুধীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতায় কোনো ধারা সৃষ্টি করে যেতে পারেন নি, তাঁর উত্তরসূরী নেই—কিন্তু তিনি একজন মৌলিক কবি। তাঁর রচনা আলাদাভাবে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ হয়ে থাকবে।

আজকাল ইংরেজি স্কুলের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। অভিভাবকেরা সেই সব স্কুলেই ছেলেমেয়েদের ভর্তি করার জন্য অতি ব্যস্ত। এ-ব্যাপারটার আর সমালোচনা করারও মানে হয় না। কারণ একথা ঠিকই, তথাকথিত বাংলা স্কুলগুলিতে পড়াশুনোর অবস্থা কতব্য নয়। কিন্তু আজও ইংরেজি স্কুলগুলিতে নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে, কথায় কথায় ধর্মঘট হয় না এবং পরীক্ষায় এখনো টোকাটুকি চালু হয়নি। এই শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর ভরসা রাখা যায়।

অবশ্য ঐ সব স্কুলগুলিতে সুশৃঙ্খলভাবে কী ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই চিন্তার প্রয়োজন আছে। ঐ সব স্কুল থেকে পাশ করা তুখোড় ইংরেজি বলা ছেলেরা প্রাইভেট ফার্মের ভালো অফিসার হয় বটে, কিন্তু দেশের শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের অনেকেরই কোনো যোগ থাকে না এবং ঐ সব স্কুলে পড়া মেয়েরা হয় ভালো অফিসার-গৃহিণী।

যাই হোক, আপাতত এই ব্যাপারের সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। একটা ব্যাপার আমরা জেনে গেছি যে, এই সব স্কুলে বাংলা শিক্ষার বিশেষ সুযোগ নেই। বাংলা ভাষা যদিও বা শেখানো হয়, বাংলা সাহিত্য নয়। এই সব স্কুলে বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর ছেলে থাকে এবং যেহেতু তাদের বন্ধুত্বের ভাষা ইংরেজি, তাই ক্রমে ক্রমে এটাই একমাত্র ভাষা হয়ে ওঠে।

এর পরে অবধারিতভাবে আর একটা কথা আসে। স্কুলের শিক্ষা যা-ই হোক, বাড়িরও তো একটা শিক্ষা আছে। যদি কোনো বাড়ির পরিবেশ ভালো থাকে, বাবা-মা চান ছেলেমেয়েদের বাংলা শেখাতে—তবু তারা শিখবে না কেন?

এই প্রসঙ্গেই কথা হচ্ছিল আমাদের এক বন্ধুর সঙ্গে। তিনি

রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং বাংলা সাহিত্য ভালোবাসেন, যদিও পেশায় ইনজিনিয়ার। তাঁর ছেলে কোনো নামকরা ইংরেজি স্কুলের ছাত্র, গল্পের বই পড়তে খুব ভালোবাসে। সে সাত-আট বছর বয়েস পর্যন্ত বাংলা-ইংরেজি দু' ধরনেরই বই পড়তে ভালোবাসতো—এখন তার এগারো বছর বয়েস, সে আর বাংলা বই পড়তেই চায় না। বাংলা ব্যাকরণ বেশ ভালোই জানে, পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়, কিন্তু বাংলা বই পড়ে না। সে পড়ে ইংরেজিতে যত রাজ্যের অ্যাডভেঞ্চারের বই, তা ছাড়া ইনিড ব্রাইটন তো আছেনই।

তাকে কিনে দেওয়া হয়েছে অবনীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ এমনকি শরৎচন্দ্রের বই। সে ঠেলে সরিয়ে রাখে, তার ভালো লাগে না। গল্পের বই তো পাঠ্য বইয়ের মতন জোর করে পড়ানো যায় না, যেটা ভালো লাগবে সেটাই পড়বে ছেলেরা। সত্যি কথা বলতে কি, বিভূতিভূষণ বা শরৎচন্দ্রের বই বাচ্চাদের ভালো লাগবার কথা নয়। আর অবনীন্দ্রনাথের বইগুলি শিশু সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত হলেও তা কিছুতেই শিশুদের উপযোগী বলা চলে না।

এর পরেই আমাদের মনে পড়ে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কথা। আমরা বাল্যকালে হেমেন্দ্রকুমারের 'যখের ধন' প্রভৃতি পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। এখনো সেই সব বই হাতে এলে আবার পড়তে ভালো লাগে—কারণ এগুলির সঙ্গে নস্টালজিয়া মিশে আছে। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এখনকার ছেলেরা ঐ-সব বই পড়ে তেমন খুশী হয় না। পুরনো পরিবেশ, পুরনো কালের যানবাহন, পুরনো ধরনের ডাকাতদের গল্প তাদের আর তেমনভাবে টানে না। আর একটা কথাও আছে, যে-সব বইগুলি সাধু বাংলায় লেখা—সে সব বই থেকে বাচ্চারা রস পাবে কী করে? এখন তো স্কুলের গোড়া থেকেই বাচ্চাদের চলিত বাংলাই শিখতে হয়, সাধু ভাষার সঙ্গে তাদের পরিচয়ই হয় না।

তাছাড়া যে-সব বই আমাদের সাহিত্যে ক্লাসিকস বলে গণ্য হয়ে

গেছে—বাচ্চারা শুধু সেগুলিই পড়বে এবং আনন্দ পাবে, সে কখনো হয়? তারা আগে পড়বে সমসাময়িক বই, পড়তে পড়তে নেশা ধরে গেলে তারপর সব কিছুই পড়বে। এবং অ্যাডভেঞ্চার, ডাকাতি, মারামারির গল্প পড়তেই যে বেশীর ভাগ কিশোর ভালোবাসে এতেও কোনো সন্দেহ নেই—এই সব বই অনেক সময়েই সাহিত্য হয় না—কিন্তু বই পড়ার নেশাটি ঠিক ধরিয়ে দেয়। এই রকম বই ইংরেজিতে অসংখ্য, সুলিখিত এবং সুলভ্য। ইংরেজি স্কুলে পড়া ছেলেরা হাতের কাছে এই সব বই ইংরেজিতে পেয়ে গেলে আর কষ্ট করে বাংলা বই পড়বে কেন?

প্রশ্ন উঠতে পারে, যারা বাংলা স্কুলে পড়ে সেই সব ছেলেদের কী অবস্থা? তারাও ভালো বই পায় না। কিন্তু বাংলা স্কুলে আজকাল ইংরেজির মান এতই নীচু যে ঐ সব স্কুলের ছেলে ইংরেজি বই পড়ছে এ প্রায় দেখাই যায় না। বাধ্য হয়ে তারা হাতের কাছে যা পায়, তা-ই পড়ে। অবিলম্বেই পড়তে শুরু করে 'বড়দের বই'—সে-ব্যাপারে অভিভাবকদের শাসন থাকলে—কেউ কেউ লুকিয়ে পড়ে, অনেকে পড়ার অভ্যেসই ছেড়ে দেয়।

বাংলায় ছোটদের উপযোগী কোনো বই-ই নেই, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। সুকুমার রায় এখনো সার্বজনীন। আরও কয়েকটি বইয়ের নাম করা যায়। সাম্প্রতিক কালের ঘটনা নিয়ে সাম্প্রতিক কালেও দু' চারখানা ভালো বই নিশ্চয়ই লেখা হচ্ছে—কিন্তু কিশোর পাঠকদের বিরাট ক্ষুধার তুলনায় তা কিছুই না। বছরে অন্তত একশোটা বই তাদের দরকার। সেই পরিমাণ বই বাংলায় নেই, ইংরেজিতে আছে—ইংরেজি স্কুলে পড়া ছেলেদের পক্ষে এইটাই সৌভাগ্যের ব্যাপার—এবং এইভাবেই তারা ক্রমশ বাংলা সাহিত্য থেকে একেবারেই দূরে সরে যায়। বড় হয়েও তারা ইংরেজি পেপারব্যাক পড়ে। যে কোনো ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসের কিংবা বিমান যাত্রীদের মধ্যে দেখা যাবে, একজনেরও হাতে বাংলা বই নেই।

সৈয়দ মুজতবা আলী

শীতের শেষে, বসন্তের প্রারম্ভেই একে একে দুঃসংবাদ আসছে। সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের জগতে ইন্দ্রপতন ঘটে যাচ্ছে। ঢাকা থেকে হঠাৎ এক সন্ধেবেলা খবর এলো, সৈয়দ মুজতবা আলী আর নেই। শুধু একজন লেখক নয়, বন্ধুবিচ্ছেদের মতন আঘাত লাগলো।

যদিও জাগতিক বিচারে সৈয়দ মজুতবা আলীর মতন প্রবীণ ও প্রখ্যাত লেখকের সঙ্গে আমাদের মতন সাধারণ মানুষের বন্ধুত্ব হবার কথা নয়। কিন্তু তাঁর সমস্ত লেখার মধ্যেই এরকম একটা বন্ধুত্বের আহ্বান আছে। পৃথিবীর কঠিনতম বিষয় নিয়ে লিখলেও তিনি সব পাঠকদের খুব কাছাকাছি ডেকে আনতেন।

আমরা এর আগে এই বিভাগে সৈয়দ মুজতবা আলীর দুই দাদা —সৈয়দ মুৰতজা আলী এবং সৈয়দ মোস্তাফা আলীর লেখা দুটি আত্মজীবনী সম্পর্কে লিখেছিলাম। তাতে আলী পরিবারের একটি চিত্র তো ফুটে উঠেছে বটেই, তা ছাড়া আমাদের কাছে বেশী পরিচিত সৈয়দ মুজতবা আলী সম্পর্কেও টুকরো-টুকরো কথা জানা যায়। সেই রকম কিছু ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি।

মুজতবা আলী বালক বয়সে যেমন ছিলেন রূপবান, তেমনি জেদী। ইস্কুলে পড়ার সময় একবার একটি গণ্ডগোল হয়। এক সাহেবের বাগানে স্কুলের কয়েকটি ছাত্র পেয়ারা চুরি করতে গিয়েছিল —ধরা পড়ার পর সাহেব তাঁর ভৃত্যকে দিয়ে ছাত্রদের মার খাওয়ান। শ্বেতাজের এই অত্যাচারের প্রতিবাদে ছাত্ররা ধর্মঘট করে। তারপর তো মিটে গেল এক সময় ধর্মঘট, অপরাধী ছাত্ররাও ক্ষমা চেয়ে

ক্লাসে যোগ দেয়, কিন্তু মুজতবা আর গেলেন না। তাঁর রাশভারী পিতা অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, তবুও। শেষ পর্যন্ত ঐ বয়সেই তাঁকে স্কুল ছাড়িয়ে চাকরিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো—একটা মোজা বোনার কলে। পরবর্তী কালে যিনি বহু শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়েছিলেন, তিনি কিশোর বয়েসে নিয়মিত সাইকেল চালিয়ে কয়েক মাইল দূরে এক মোজার কলে চাকরিতে যেতেন।

তাঁর শান্তিনিকেতনে ভর্তি হওয়ার ঘটনাটিও চমকপ্রদ। রবীন্দ্রনাথ একবার সিলেটে গিয়েছিলেন সফরে—একটি সভায় কিশোর মুজতবা অভিভূত হয়ে শুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা। মুগ্ধ হয়েছিলেন। তারপর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে যাবার পর মুজতবা তাঁর কাছে একটা চিঠি লিখে জানতে চান, জীবনের সার্থকতা কী? রবীন্দ্রনাথ কী উত্তর দিয়েছিলেন তা আজ আর জানা যায় না—তা এই কিশোরকে এতই আকৃষ্ট করে যে তিনি জেদ ধরে বসলেন, শান্তিনিকেতন ছাড়া আর কোথাও পড়াশুনো করবেন না। আলী পরিবারে এটা ছিল একটা চমকপ্রদ প্রস্তাব। মনে রাখতে হবে, প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগে শান্তিনিকেতন সম্পর্কে অনেকেরই সঠিক ধারণা ছিল না। একটি রক্ষণশীল মুসলমান পরিবারের ছেলের পক্ষে শান্তিনিকেতনে পড়তে আসার প্রস্তাব প্রায় অচিন্তনীয়ই বলা যায়। কিন্তু মুজতবার জেদই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছিল—বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর তিনি ছিলেন প্রথম ব্যাচের অন্যতম ছাত্র।

মুজতবা আলীর পরবর্তী জীবনের এরকম বহু কাহিনী তাঁর সুহৃদ ও অন্তরঙ্গরা জানেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত অলিখিত থেকে গেল। আশা করি সেগুলি একদিন প্রকাশিত হবে। তখন দেখা যাবে, এই মানুষটি একটা জীবনেই যেন অনেকগুলি জীবন কাটিয়ে গেছেন। ছন্নছাড়ার মতন ঘুরেছেন বিভিন্ন প্রান্তে, পৃথিবীর অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী, কিন্তু বাংলা ভাষার জন্যই তিনি যে সমস্ত

মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হিটলার বিষয়ে তাঁর ছিল অদম্য কৌতূহল। মাত্র কয়েক বছর আগেও তিনি যে নিজ ব্যয়ে জার্মানিতে গিয়েছিলেন, তার প্রধান কারণ ছিল হিটলার বিষয়ে মালমশলা সংগ্রহ। হিটলারের অভ্যুত্থান থেকে শুরু করে মৃত্যুরহস্য পর্যন্ত সব কিছু সম্পর্কেই তাঁর প্রচুর অনুসন্ধানমূলক রচনা আছে। হিটলার বিষয়ে তিনি পৃথিবীর বিশেষজ্ঞদের অন্যতম বলা যায়, কিন্তু যেহেতু তাঁর রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে বাংলায় —তাই হয়তো রেফারেন্স হিসেবে তাঁর রচনাগুলি উল্লিখিত হবে না।

ভ্রমণকাহিনী, উপন্যাস ও রম্যরচনায় তিনি অবাধে বিচরণ করেছেন যে-কোনো সময়। 'দেশে বিদেশে' প্রকাশের পরই সাড়া জেগে যায়। আমাদের মনে আছে। এক সময় যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত' বইখানি নিয়ে বাংলা সাহিত্যে খুব হুলুস্থুল চলছিল—তারপরই হঠাৎ এসে পড়ে 'দেশে বিদেশে'। সেই সময় এক-একজন অচেনা লেখক অকস্মাৎ এসে রাজ্য জয় করেছিলেন—তাদের মধ্যে অনেকেই অবশ্য চাপা পড়ে গেলেন যথাসময়ে—কিন্তু মুজতবা আলী চিরকালের জন্য থেকে গেলেন।

মুজতবা আলীর ভাষার যে একটা স্থায়ী প্রভাব পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যেও থাকবে—এ-বিষয়ে আমার মনে কোনো সংশয় নেই। এই ভাষাকে শুধু রস-রসিকতা কিংবা আড্ডার ভাষাকে জাতে ওঠানোর ব্যাপার ভাবলে খুব ভুল করা হবে। সাধু ভাষা থেকে চলতি ভাষায় উত্তরণ যেমন একটি বিরাট ঘটনা—তেমনভাবেই সৈয়দ মুজতবা আলী ভাষাকে আর এক ধাপ এগিয়ে দিলেন। তিনি দেখালেন যে, বিশ্বের যে-কোনো ভাষা থেকেই শব্দ নিয়ে আসায় কোনো ক্ষতি নেই—যদি ঠিক মতন ব্যবহার করা যায়। মুজতবা আলী বহু ভাষাবিদ্ ছিলেন বটে কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে চমকপ্রদ লাগে তাঁর কিছু কিছু গ্রাম্য বা আঞ্চলিক শব্দের যথাযথ

ব্যবহার। সম্পূর্ণ মৌখিক ভাষা বা কথ্য ভঙ্গিতেও তিনি যে-কোনো বিষয় নিয়ে অপূর্ব দক্ষতায় লিখে যেতে পেরেছেন।

তাঁর নিজস্ব অধ্যয়নের বিষয় ছিল তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব। এই বিষয় নিয়ে তিনি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য নানা জায়গায় করলেও একটা কোনো সম্পূর্ণ গ্রন্থ লিখে যেতে পারেননি। শুনেছি, লেখার ইচ্ছে ছিল; সময় পেলেন না—এটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশী দুঃখের কারণ। তাঁর ঘনিষ্ঠদের কাছে শুনেছি, গৌতম বুদ্ধের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার আগ্রহ তিনি প্রায়ই প্রকাশ করতেন। তাঁর ধারণা ছিল, গৌতম বুদ্ধকে এখনো সঠিকভাবে মানুষ বোঝেনি। অনুরূপভাবেই তিনি লিখতে চেয়েছিলেন হজরত মহম্মদ সম্পর্কে। কোনোটাই শেষ পর্যন্ত হলো না।

দেশ পত্রিকায় যখনই পঞ্চতন্ত্র প্রকাশিত হয়েছে—তখন ওই বিভাগটি ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয়। দেশ হাতে পেয়ে প্রথমেই পাতা খুলে 'পঞ্চতন্ত্র' দেখে নিতাম। এ-বিষয়ে আমি একা নই, অগণিত পাঠক অনুরাগী ছিলেন আলী সাহেবের রচনার। তাঁদের সকলের হয়ে মৃত্যুতে উত্তীর্ণ এই পরমাশ্চর্য লেখকের প্রতি আমার শোক জানাই।

লেখক ও পাঠক

একজন লেখককে আমি একটু একলা পেয়ে জিজ্ঞেস করলুম, লিখতে আপনার কেমন লাগে?

তিনি এক কথায় উত্তর দিলেন, ভালো না। তারপর চুপ করে রইলেন।

আমার আরও অনেক প্রশ্ন ছিল, কিন্তু সরাসরি এরকম উত্তর পেয়ে কীরকম ভয় পেয়ে গেলুম। লেখকের মুখখানা একটু দুঃখিত ধরনের মনে হলো। আমি অবশ্য বুঝতে ভুল করিনি যে তিনি সত্যি কথা বলছেন না।

তিনি আবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, লিখতে হবে ভাবলেই গায়ে জ্বর আসে; বুঝলে। তবে এ-কথাও ঠিক, লেখা শুরু করার পর এক ধরনের ভালো লাগা এসেই যায়। তখন আর অন্য কিছু খেয়াল থাকে না। তবে যা-ই বলো, লেখার কাজটা বড় পরিশ্রমের।

আমি বললাম, সব কাজই তো পরিশ্রমের। লেখক ছাড়া অন্য আরও অনেকেই তো মাথার কাজ করেন, তাঁদের কি পরিশ্রম নেই?

লেখক বললেন, তা বটে। সবাই বোধ হয় নিজের কথাটাই বেশী করে ভাবে। এক-একদিন সকালে ধরো ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে, কিংবা হাওয়া উঠেছে উত্তাল—তখন মনে হয়, আজ না লিখে কি চুপচাপ শুয়ে থেকে আলস্য করতে পারি না? কিংবা, হঠাৎ কোথাও বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়? এমন দিনে অনেক লোক তো অফিসে ক্যাজুয়াল ছুটি নেয়। কিন্তু আমার উপায় নেই। আমাকে লিখতেই হবে।

আমি বললুম, কেন, সম্পাদকরা বড্ড তাড়া দিচ্ছেন, তাই না?

তিনি বললেন, তা তো হবেই। এখন সময়টা যে বড় খারাপ। শিরে সংক্রান্তি যাকে বলে। তা ছাড়াও কী জানো, একটা লেখা একবার শুরু করলে, সেটা ভেতর থেকে অনবরত তাড়া দিতে থাকে। তখন মনের মধ্যে আর কিছু থাকে না—শুধু সেই গল্পের চরিত্রগুলি ছাড়া।

তোমাকে একদিনের ঘটনা বলি। এই রকম একটা বাদলা দিনে হঠাৎ ঠিক করলুম, আজ আর কিছুতেই লিখবো না। কেউ যাতে এসে ধরতে না পারে তাই বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলুম। এ যেন নিজের কাছ থেকেই নিজে পালানো। কোথায় আর যাই, ট্রেনে চেপে চলে গেলুম ডায়মণ্ডহারবার।

বৃষ্টির দিন, বেশী ভিড় ছিল না। গঙ্গার ধারে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসলুম। ছাতা নিয়ে গিয়েছিলুম, অসুবিধে নেই। অনেকদিন বৃহৎ কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্যের সামনে যাইনি। ওখানে ওই প্রশস্ত নদীর ওপর বৃষ্টিপাতের দৃশ্য চোখে এক প্রকার আরাম দেয়। দু'এক পলক সেদিকে তাকিয়ে ছিলুম মাত্র, তারপর লোকে যেমন হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যায়, সেই রকমই, আমি চৈতন্য হারালাম বলতে পারো। যখন ঘোর ভাঙলো, তখন আড়াই ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। ঘড়ি দেখে চমকে উঠতে হলো।

ওই আড়াই ঘণ্টা আমি ওখানেই বসেছিলাম, নদী দেখিনি, বৃষ্টি দেখিনি, মেঘ দেখিনি, মানুষ দেখিনি—আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধও ছিল না।

আমি জিজ্ঞেস না করে পারলুম না, আপনি কী করছিলেন তা হলে?

তিনি বললেন, আমি আমার সদ্য শুরু-করা লেখাটির বিষয়ে ভাবছিলাম। সেই লেখার মধ্যে দুজন পুরুষ চরিত্র ও একটি নারী চরিত্র। আমার মনশ্চক্ষু জুড়ে রইলো, তারা কথা বলতে

জাগলো, তারা ঝগড়া করলো, ইচ্ছে মতন গল্প বদলালো, তারা আমার চোখের সামনে থেকে সব কিছু আড়াল করে রাখলো। লেখাটার পটভূমিকা আসাম—বস্তুত সেই সময়টা আমরা ডায়মণ্ডহারবারে ছিলাম না, আসামে চলে গিয়েছিলাম।

আমি বললাম, ওরা তো আপনারই সৃষ্টি। নিজের সৃষ্টিকে স্বচক্ষে দেখা তো আনন্দেরই ব্যাপার হতে পারে।

মোটেই না। সৃষ্টির একটা আনন্দ আছে ঠিকই, কিন্তু এর যে একটা বিশেষ দুঃখও আছে সেটা তুমি বুঝবে না। আমার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ বলে যেন আর কিছু নেই, আমার কামনা-বাসনাগুলোও চলে যাচ্ছে—সবই আমি চরিত্রগুলোর জন্য ব্যয় করছি। ওদের এক-একজনকে জীবন্ত করার জন্য আমি ব্যয় করে যাচ্ছি আমার জীবনীশক্তির এক অংশ।

—আমার মনে হয়, আপনি এটা একটু বাড়িয়ে বলছেন, জীবনীশক্তি খানিকটা ক্ষয়ে যাচ্ছে ঠিকই, খুব সুখে আমোদ-আহ্লাদে থেকে কে কবে সাহিত্য রচনা করেছে—তবে আপনার সুখ দুঃখ, কামনা বাসনা দিয়েই একটা জিনিস গড়ে ওঠে, যার নাম অভিজ্ঞতা—সেই অভিজ্ঞতা হবার পরই তো আপনি এই চরিত্র-গুলিকে গড়ছেন। তাই না?

—ব্যাপারটা এরকম নয়। তুমি লেখো না, তুমি বুঝবে না।

—আচ্ছা, আর একটা বলুন। ছেলেবেলায় আপনি যখন লেখক হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তখন কি ভেবেছিলেন, একদিন আপনাকে এরকম কষ্ট পেতে হবে?

—ছেলেবেলায় আমি লেখক হবার স্বপ্ন দেখেছিলুম, কে বললে তোমাকে?

—স্বপ্ন দেখেননি?

—মোটেই না। আমি যতদূর জানি, যারা ছেলেবেলা থেকেই লেখক হবার স্বপ্ন দেখে—তারা অনেকেই লেখক হয় না। বড়

জোর ছেলেদের লেখক হয়। আনন্দমেলায় যেসব বাচ্চাদের লেখা ছাপা হয়, তাদের মধ্যে ক'জন বড় হয়ে প্রকৃত লেখক হয় ?

আমি আমতা আমতা করতে লাগলুম। তিনি বললেন, ছেলেবেলায় আমার অন্য অনেক রকম স্বপ্ন ছিল। বৈজ্ঞানিক কিংবা আবিষ্কারক কিংবা নিছক পর্যটক, এমনকি একবার একটা ঘুড়ির দোকান খোলার কথাও ভেবেছিলুম। কী করে যে কবে লেখক হয়ে গেলুম, তা আমি নিজেই জানি না।

—আপনার জীবনটা যদি প্রথম থেকে শুরু করতে দেওয়া হয় আবার, তা হলে আপনি কী করবেন ? লেখক হবেন না ?

লেখক মহাশয় আবার একটু গম্ভীর হয়ে রইলেন। চশমাটা টিপলেন নাকের কাছে। তারপর বললেন, নাঃ, এই রকমই হবো আবার। এতে দুঃখ আছে বটে, কিন্তু সেই দুঃখটাও উপভোগ্য। প্রত্যেকবার নতুন লেখার সময় আমি অন্য মানুষ হয়ে যাই। কখনো বিচরণ করি অতীত যুগে, কখনো কলেজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গী হয়ে যাই—এর উত্তেজনা কম নয়।

লেখক এবার হেসে বললেন, হ্যাঁ, আর একটা আছে। পাকে-চক্রে লেখক হয়ে যাবার পর এখন একটা অন্য স্বপ্ন প্রায়ই দেখি। আমরা ভাবি যে এই সময় বা এই যুগকে বদলে দেবার ক্ষমতা আছে আমাদেরই হাতে। এটা যে একেবারেই ভুল স্বপ্ন, তা মনেই পড়ে না।

একজন লোক চার পাঁচ মাস ধরে বেকার। একটি কারখানায় সামান্ত শ্রমিকের কাজ করতো, কারখানাটিও কয়েক মাস ধরে লক আউট। কোনো উপার্জন নেই, ক্রমশ হাঁড়ি চড়া বন্ধ হবার উপক্রম। তারপর সাতদিন ধরে আর খাওয়াই জোটে না। সংসারে স্ত্রী ও চার-পাঁচটি বাচ্চা, বুড়ি মা, এমনকি বিধবা বোনও থাকতে পারে। বাচ্চারা খেতে না পেয়ে কাঁদে, কারণ তারা পঞ্চম পরিকল্পনা কিংবা গরিবী হঠাও সম্পর্কে কিছুই জানে না। বাচ্চাদের একঘেয়ে কান্নায় লোকটির এক সময় মেজাজ গরম হয়ে যায়, তার অক্ষমতা বা ব্যর্থতা রূপান্তরিত হয় সাঙ্ঘাতিক ক্রোধে। সে হঠাৎ সবচেয়ে বাচ্চা ছেলেটিকে তুলে নিয়ে এক আছাড় মারে। শিশুটির ক্ষুধা-তৃষ্ণার শেষ হয়ে যায়।

একথা কে না জানে যে আমাদের দেশের শতকরা পঞ্চাশজন লোকই ঠিকঠাক দু' বেলা খেতে পায় না। বেকারের সংখ্যা চল্লিশ লাখ কিংবা আরও বেশী। কলকারখানায় প্রায়ই লক আউট, ধর্মঘট, ছাঁটাই ইত্যাদি হয়। অনেক পরিবার অনাহারে থাকে। ভিখারী ও চোর-ডাকাতের সংখ্যা বাড়ে। কিন্তু এসবের মধ্যে বৈচিত্র্য নেই, তাই সংবাদপত্রের সংবাদ হয় না। কিন্তু একটি ক্ষুধার্ত বেকার যখন তার শিশুপুত্রকে আছড়ে মারে কিংবা নিজে ট্রেন লাইনে মাথা দেয়, তখন সেটি খবর হয়ে ওঠে। অনেক খবরের কাগজে সেটি চৌকো-বর্ডার দিয়ে গাঢ় হরফে ছাপায়।

পাঠকরা সেই খবরে বিচলিত হয়। দেশের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মনে হয়, কিছু একটা করা দরকার।

অনেকে অবশ্য রাজনৈতিক পন্থায় শাসকদলের ক্ষমতা বদলের জন্য সক্রিয় আছেন ও থাকবেন। আর একদল, যারা একটু অলস প্রকৃতির, যাদের নাম দিচ্ছি 'পাঠকশ্রেণী', তারা এইরকম উদ্বেলিত অবস্থায় কোনো একজন লেখককে চিঠি লেখে।

সেই চিঠির ভাষা দু'রকম্ হয়। কিছু একটা করা দরকারের চিন্তায় যাদের রক্ত টগবগ করে ফোটে তারা কিন্তু নিজেরা আসলে কিছুই করে না, তারা লেখককে জানায়, দেশের এই অবস্থায় আপনারা কী করছেন? আর কতদিন অমুক শ্রেণীর দালালি করবেন? কিংবা, সি আই এ-র টাকা খেয়ে শুধু প্যানপ্যানানি প্রেমের গল্প লিখে দেশের যুবশক্তিকে বিপথে চালিত করছেন। লজ্জা করে না আপনার? শুধু টাকা রোজগারের দিকেই আপনার ঝোঁক। ছিঃ।

আর এক দলের ভাষায় থাকে অনুরোধ। দুঃখের সুরে তাঁরা বলেন, এই যে দেশের অবস্থা, মানুষ না খেয়ে মরছে, মা তার মেয়েকে বিক্রি করে দিচ্ছে—এর প্রতিকারের জন্য আপনি কিছু করবেন না? আপনি আমার প্রিয় লেখক, আপনার কলমের শক্তি আছে, সেই কলমকে দেশের কাজে লাগান। আগুনের মত ঝলসে উঠুক আপনার লেখা, মানুষকে সত্যিকারের একটা পথ দেখান!

লেখক এই চিঠি পড়েন। একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে বসে থাকেন। প্রথম দল পাঠকের গরম ভাষায় লেখা চিঠি তিনি একটু পরেই ছুঁড়ে ফেলে দেন। তিনি বিরক্ত হন রীতিমতন, সেই বিরক্তি অনেক সময় সারাদিন ধরে থাকে। টাকা রোজগারের কথা উল্লেখ থাকার জন্যই প্রধানত তাঁর বিরক্তি। কোনো লেখকের লেখার সমালোচনা প্রসঙ্গে টাকা পয়সার প্রশ্ন তোলে শুধু সেইসব পাঠক—যারা একটু ছিংসুটে প্রকৃতির। অন্য আলোচনা প্রসঙ্গে হঠাৎ টাকা পয়সার কথা তোলা যে একটা অভদ্রতা, এটা তাঁদের মনে থাকে না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠকদের চিঠি পেয়ে লেখক সত্যিই কিছুটা বিচলিত বোধ করেন। ভালোবেসে কিংবা স্নেহের সঙ্গে কেউ কোনো

অনুরোধ করলে রক্ষা না করে পারা যায় না। তখন লেখক একটি কঠিন সমস্যায় মধ্যে পড়েন। তিনি কী করে রাখবেন এই অনুরোধ। তিনি দেশের অবস্থা জানেন। তিনি জানেন দারিদ্র্য ও হতাশার কথা। এটা নতুন কিছু নয়। হঠাৎ শিশুকে আছড়ে মারা কিংবা সন্তান বিক্রির মতন নাটকীয় ঘটনায় পাঠকের কোমল মন বিচলিত হয়েছে। সেই পাঠক কোনো রাজনৈতিক নেতাকে বিশ্বাস করেন না, বিশ্বাস করেন লেখককে, তাই তাঁরই ওপর ভার দিয়েছেন সমস্যা সমাধানের। কিন্তু এই গুরুভার বহন করার সামর্থ্য কি তাঁর আছে? এই সমস্যা সমাধানের পথ কী?

হ্যাঁ, তিনি লিখতে পারেন। এই দুঃখ দারিদ্র্যের চিত্রটি তিনি মর্মন্তুদভাবে তুলে ধরতে পারেন। কিন্তু তাতে কী ফল হবে? যে-কথা সবাই জানে, ছাপার অক্ষরে তা দেখলেই কি লোকেরা সচেতন হবে? প্রত্যেক লেখক বোধ হয় এ কথাটা এখন গভীর-ভাবে জেনে গেছেন যে, লিখে কিছু হয় না। লিখে একটা দেশের সরকারের বদল ঘটানো যায় না, মানুষের দুঃখ দূর করা যায় না। লেখার আবেদন শুধু একজন ব্যক্তির কাছে, সমষ্টির কাছে তা মূল্যহীন।

তা ছাড়া, লেখক ভাবেন, তিনি এই দুঃখ দারিদ্র্যের কথা নিয়েও একটা বই লিখেছিলেন কিছুকাল আগে—সে বইখানার কথা অনেকের মনে নেই। অনেকে পড়েই না। দুঃখ দুর্দশার কথা, যারা দুঃখী তারাও পড়তে চায় না।

আমরা প্রায় ছেলেবেলা থেকেই একটা কথা শুনে আসছি যে, সার্থক নাটক একটি সাহিত্যের যৌবন সূচিত করে। অর্থাৎ একটু ঘুরিয়ে বললে, যে সাহিত্য যৌবনে উপনীত হয়েছে, সেই সাহিত্যেই সার্থক নাটক রচিত হওয়া সম্ভব।

তারপর থেকে অনেক দিন কেটে গেল। এখন মনে প্রশ্ন জাগে যে, তা হলে কি বাংলা সাহিত্যের এখনও যৌবন আসেনি? না হলে, সার্থক নাটক কোথায়?

নাটকের ব্যাপারে আমরা ঔদাসীন্যের কথা বলতে পারি না। কলকাতা শহরে নাটক নিয়ে প্রচুর হইচই হয়। এবং গত কয়েক বছরে আমরা প্রায় চোখের সামনেই দেখলাম যে, কয়েকটি দুঃসাহসী শৌখিন দল পেশাদারী মঞ্চগুলিকে ঠেলে এক কোণে ফেলে দিয়ে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়ে দিয়েছেন। এখন বাংলা ভাষায় সার্থক নাটকের অভিনয়ের প্রসঙ্গে পুরোনো অভিজাত রঙ্গমঞ্চগুলির নাটকের কথা মনেই পড়ে না। তারা এখন অতি নাটক কিংবা ক্যাবারের উলঙ্গ নৃত্য দিয়ে কোনোক্রমে অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এই সব শৌখিন নাটক দলগুলিও কি সব নাটকের অভিনয় করেন?

এখানে বোধ হয় নাটক ও নাট্যসাহিত্য নিয়ে একটা গুরুতর দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে। নাট্যসাহিত্য একটা গালভারি কথা, অনেকটা কাব্যসাহিত্যের মতন, খানিকটা ধোঁকা বোকা। বস্তুত, নাট্যসাহিত্য জিনিসটা কি তা সহজে বোঝা যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যের যেটুকু আমরা পরিচয় পাই, তার অধিকাংশই নাটক,

অথচ পণ্ডিতরা বলেন, ওগুলো খাঁটি নাটক নয়। পণ্ডিতরা সব ব্যাপারই ভালো জানেন। তাঁরা বলেন, ওগুলি নাকি আসলে দৃশ্যকাব্য। সেটা যে আবার কী বস্তু, তা বোঝা আরও দুষ্কর। তবে শেক্সপীয়ার ভালো নাটক লিখেছেন, সেগুলি পড়তেও ভালো লাগে এবং অভিনয় দেখতেও ভালো লাগে, এ বিষয়ে কারুর কোনো দ্বিমত নেই। তাছাড়াও, একালের ব্রেখট, আয়োনেস্কো. মিলার, অ্যালবি, পিণ্টার প্রমুখ নাট্যকারদের রচনা যেমন সাহিত্য-পাঠকদের তৃপ্তি দেয়, তেমনি মঞ্চেও সেগুলির সম্ভাবনা দারুন। সে রকম নাটক বাংলায় কোথায়?

নাটক সম্পর্কে আমাদের উদ্দীপনার অভাব নেই। সম্প্রতি পাবলিক থিয়েটারের শতবর্ষ উপলক্ষে প্রচুর গবেষণা ইত্যাদি হয়েছে। এই একশো বছরে কোন্ কোন্ মঞ্চেতে কবে কোন্ নাটক অভিনীত হয়েছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায় এবং এই নিয়ে আবার তর্কবিতর্কও হয়। এক এক সময় মনে হয়, এ-সবই পণ্ডশ্রম। অথবা, রাজশেখর বসু যাকে বলেছেন—'কাক দন্ত গবেষণ'।—অর্থাৎ কাকের দাঁতের রং সাদা কি কালো এই নিয়ে তর্কবিতর্ক, তার আগে জেনে নেওয়া হয়নি যে কাকের দাঁতই নেই। এই একশো বছরে বেশ কয়েকজন বড় অভিনেতা ও অভিনেত্রী জন্মেছেন আমাদের দেশে—কিন্তু তাঁরা যে-সব নাটকে অভিনয় করেছেন, সেগুলি চিমটে দিয়েও ছোঁওয়া যায় না।

পণ্ডিতরা অবশ্য গিরীশবাবু, ক্ষিরোদপ্রসাদ, ডি এল রায় প্রমুখের নাটকগুলিকেও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। বি এ, এম এ ক্লাসে সেগুলি পড়ানো হয়, গবেষকরা সেই বিষয়ে বই লিখে ডক্টরেট পান। কিন্তু সেগুলি যে কি অখাদ্য তা বলা যায় না। এ কথা এখন স্পষ্ট করে বলার সময় এসেছে যে, ওই সব নাটকগুলির মধ্যে সাহিত্যের স-ও নেই।

সর্বাধুনিককালের নাটকগুলি দেখে চমৎকৃত হয়ে যেতে হয়।

মঞ্চসজ্জা, অভিনয় ও পরিচালনা অনবদ্য। নামকরা দলগুলি ছাড়াও, অনেক ছোটখাটো দলও এমন একটা মান আয়ত্ত করে নিয়েছে, যা গর্ব করার মতন। এখানে আমার এক বন্ধুর একটি সাক্ষ্য দিই। তিনি বছর সাত আট আগে 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' এই নাটকটির অভিনয় দেখেছিলেন নিউইয়র্কে, লণ্ডনে এবং কলকাতায়। এই তিনটি প্রোডাকশানের মধ্যে কলকাতার— তখন অল্পখ্যাত এখন বিখ্যাত—দলটির অভিনয় এবং উপস্থাপনাই তাঁকে সব চেয়ে বেশী মুগ্ধ করেছিল। আমাদের অনেক প্রোডাকশান সম্পর্কেই এ কথা খাটে।

যাই হোক, এ সব ক্ষেত্রে তো বিদেশী নাটকের ভাবানুবাদ নিয়েই কাজ চলছে। মৌলিক নাটক দিয়েও সাড়া জাগিয়েছেন কয়েকটি দল। লোকেরা ভিড় করে দেখতে যায় সেই সব নাটক, মুগ্ধ হয়, আলোচনা করে। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে সেই সব নাটক কি কোনো স্থান করে নিতে পেরেছে? আমি কয়েকটা পড়ে দেখেছি, হতাশ হয়েছি। ইদানীংকালের দুঃসাহসী মঞ্চ-সফল নাটক-গুলির একটাও সাহিত্য পদবাচ্য নয় এই আমার ধারণা, অবশ্য ভুল হতেই পারে। অপর পক্ষে, সাহিত্যিকরা মাঝে মাঝে যে দু'একটি নাটক লেখেন সেগুলি মঞ্চে পাত্তা পায় না।

তা হলে কি একথা ধরে নেওয়া যায় যে, চলচ্চিত্রের মতন, নাটকও আর একটা শিল্পরূপ হতে চাইছে, সাহিত্যের সঙ্গে যার যোগাযোগ প্রত্যক্ষ নয়? এটা আমার জিজ্ঞাসা মাত্র, সুচিন্তিত অভিমত নয় মোটেই।

গানের কাছ থেকে কবিতা সরে এসেছে অনেক দূরে। অনেক দিন পর্যন্ত, বিশেষত ছাপার অক্ষরের প্রসারের আগে পর্যন্ত কবিতাকে নির্ভর করতে হতো সুরের ওপর। সুর ছিল তার প্রচারের যানবাহন। তখন কবিতা ও সঙ্গীত ছিল হরিহরাত্মা, আলাদা করে চেনার কোনো উপায় ছিল না। বৈষ্ণব পদাবলীগুলি গান না কবিতা? ছাপার অক্ষরে দেখলে সেগুলিকে গান বলে গণ্য করি, আসরে গায়কের মুখে শুনলে পদাবলী গান।

সুরের প্রত্যক্ষ সাহচর্য পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই কবিতা অনেকটা সরে আসে জনসাধারণ থেকে। সুরের প্রতি মানুষের টান অনেকটা ইনসটিনকটিভ, যে কোনো সুরেলা উচ্চারণের প্রতিই মানুষ খানিকটা আগ্রহী হয়, যে-কারণে ফেরিওয়ালারা সুর করে তাদের জিনিসের নাম উচ্চারণ করে। এদিকে ছাপার অক্ষরের ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত নতুন বলেই এর থেকে রস গ্রহণ করা এখনো সব মানুষের তেমন রপ্ত হয়ে ওঠেনি। ছাপার অক্ষর পড়তে যারা শেখে, তাদের মধ্যেও খুব কম সংখ্যক মানুষই এখনো এর থেকে আনন্দ গ্রহণ করতে পারে। কবিতা, সেই জন্যই অনেকটা এখন বিশেষ এক সীমিত শ্রেণীর কাছে আদরণীয়।

অপরপক্ষে কবিদের ছেড়ে দেবার ফলে গানের বাণীগুলি রচনার ভার চলে যায় অকবিদের হাতে। এর ফল সব সময় যে খারাপ হবে, তার কোনো মানে নেই। আমাদের মার্গ সঙ্গীতে, একমাত্র তারানা ছাড়া আর সবক্ষেত্রেই বাণীর অংশ সামান্য, বড় বড় ওস্তাদরা নিজেরাই তা রচনা করেন এবং সুরের প্রাবল্যে সেগুলি উপভোগে

কোনো বাধা হয় না। 'গরজে ঘটা ঘন কারি কারি' কিংবা 'পিয়া কি মিলন কি আশ'—এই সব লাইনের মধ্যে কোনো আহামরি কবিত্ব নেই, বরং আমাদের মুগ্ধ করে এর সারল্য এবং এর অন্তর্জাগী সুরের মাধুর্য।

সুরের সাহচর্য ছেড়ে কবিতা সরে এলেও, বেশ কিছুদিন পর্যন্ত কবিরা সুরের প্রতি একটি টান বোধ করেছেন। বড় বড় কবিরা আলাদাভাবে লিখেছেন গান, নিজেরাই সুর দিয়েছেন ও গেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল—এঁরা সুরকার ও গায়ক হিসেবেও বিখ্যাত। এঁদের কবিসত্তার সঙ্গে এঁদের গায়ক-সত্তার খুব একটা মিল আছে, এমনও বলা যায় না। এই গান-গুলিকে ভারতীয় ঐতিহ্যময় রাগ সঙ্গীতের সমপর্যায়ভুক্ত বলা যায় না, কারণ এতে তান বিস্তারের সুযোগ নেই এবং গায়ক গায়িকাদের মুন্‌শীয়ানা দেখবার সুযোগও কম। অনেকে এই গানগুলির নাম দিয়েছেন কাব্য-সংগীত, অর্থাৎ আবার সেই কবিতা ও গানকে মেলাবার চেষ্টা।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবিদের যেমন আধুনিক কবি বলা শুরু হলো, তেমনি পরবর্তী গানকেও বলা হতে লাগলো আধুনিক গান। এখনো এই নাম চলছে। আধুনিক কবিরা যেমন সুরকে একেবারে পরিত্যাগ করেছে, তেমনি আধুনিক গায়করা বর্জন করেছে কাব্যরস। দুটি এখন দুই মেরুতে। আধুনিক কবিতার আদি পুরুষ বলতে জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে প্রমুখকে বোঝায়—এঁরা কেউই গান রচনা করেন নি, গায়ক হিসেবেও প্রসিদ্ধি নেই।

আধুনিক কবিতার তুলনায় আধুনিক গান কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ। আমার মতে নজরুল এবং দ্বিজেন্দ্রলালই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক গানের জন্মদাতা। রবীন্দ্রনাথ এবং অতুলপ্রসাদের গানের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যা অননুকরণীয় কিংবা অনুকরণ করলেই নির্ঘাত মৃত্যু। নজরুল বা দ্বিজেন্দ্রলালের এমন বৈশিষ্ট্য নেই, বা থাকলেও

এঁরা আরও এমন অনেক গান রচনা করেছেন যাতে কোনো কাব্যরস নেই এবং সুরও চটুল। গ্রামোফোন কোম্পানির সুরকার ও গীতিকার হিসেবে নজরুল যে-সব অজস্র গান রচনা করেছেন, সেগুলিই প্রকৃত-পক্ষে গোড়ার দিককার আধুনিক গান। দ্বিজেন্দ্রলালও মঞ্চের জন্ত যে কিছু কিছু গান লিখেছেন, সেগুলিকে দ্বিজেন্দ্রগীতি আখ্যা দিলে বেশ ভারিক্কি শোনায় বটে, কিন্তু সেগুলি আধুনিক গানের নিশ্চিত সমগোত্রীয়।

আধুনিক গান এক সময় জনপ্রিয়তা পেয়েছে খুবই, হিন্দী গানের প্রাদুর্ভাবের আগে পর্যন্ত তো বটেই। কিন্তু সম্মান পায়নি। কলেজের জলসায় কিংবা পাড়ার ফাংশানে আধুনিক গানের দারুণ চাহিদা, কিন্তু কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বর্ধনা সভায় কিংবা বড় ধরনের কোনো জাতীয় অনুষ্ঠানে আধুনিক গান পরিবেশনের কথা এখনো কেউ চিন্তাও করে না। এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার নয়?

জনসাধারণের কাছ থেকে সরে যেতে যেতে অনেক দূরে সরে গিয়ে কবিতা, তথা আধুনিক কবিতা যেমন আরও কঠিন, কুঠিনতর হয়েছে—সেই রকমই জনপ্রিয়তা পেতে পেতে আধুনিক গান ক্রমশ তরল, অতি তরল হতে হতে এখন একেবারেই সুরও কথার একটা জগাখিচুড়িতে পরিণত হয়েছে। এই সব গান যাঁরা রচনা করেন কিংবা সুরারোপ করেন, তাঁদের কাব্য-জ্ঞান নেই বা সুর-জ্ঞান নেই—একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। জনরুচির চাহিদা মেটাবার জন্ত এখন সুরুচির দিকে জ্রক্ষেপও করা হয় না।

আধুনিক গানকে খানিকটা জাতে তোলার জন্য মাঝে মাঝে কিছু চেষ্টা হয়েছে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এক সময় সুকান্ত ভট্টাচার্যের কিছু কবিতাকে সার্থক গানে রূপান্তরিত করেছিলেন। সলিল চৌধুরী এবং হেমাঙ্গ বিশ্বাসও আধুনিক কালের উপোযোগী আধুনিক। এ ছাড়া তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অবাক হবার কথা—সজনী দাসও কিছু ভালো গান লিখেছেন।

তারপর ? অনেক দিন এর পর আর এরকম কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।

হিন্দী গানের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বাংলা গান বেঁচে থাকার তাগিদেই বোধ হয় আরও নিম্নরুচিতে নামতে চাইছে। এর প্রতিবাদস্বরূপ কিছু কিছু নবীন গায়ক আবার কাব্যসঙ্গীতের প্রসারের চেষ্টায় ঝুঁকেছেন আধুনিক কবিতার দিকে। খ্যাতিমান আধুনিক কবিদের রচনা বেছে নিয়ে সুরারোপ করে এঁরা গাইছেন বিভিন্ন জায়গায়। অজিত পাণ্ডে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বিষ্ণু দে-র কবিতার গান রেকর্ড করেছেন, আমি শুনেছি। ঋষিণ মিত্র, উৎপল চক্রবর্তী এবং আরও কেউ কেউও এরকম আধুনিক কবিতাকে সুর দিয়ে গাইছেন। জনসাধারণের মধ্যে এর খুব প্রচার হয়নি এখনো, গানগুলিও যে সবক্ষেত্রে খুব সার্থক হয়েছে তা বলা যায় না। কথা ও সুরে অনেক জায়গায় মেলেনি। আধুনিক গানের কাঁচা সুরে ভাবগর্ভ বাণী বসালে তা শ্রবণ সুখকর হয় না। এঁরা লোকসংগীতের সুরের ভাণ্ডারকে উপেক্ষা করছেন কেন ?

দেশ পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদকের মুখে শুনেছি, মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে জীবনানন্দ দাশ তাঁকে একদিন ক্ষুব্ধভাবে বলেছিলেন কবিতা লিখে তো কিছুই হলো না—আমি এবার গল্প উপন্যাস লিখতে চাই।

এরকম ইচ্ছে হওয়া কবির পক্ষে খুব অস্বাভাবিক নয়। তাঁর সমসাময়িক কবিরা অনেকেই সমানভাবে গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। কল্লোলযুগের বিখ্যাত কবিদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ কবিতা এবং গল্প-উপন্যাসে সমান পারদর্শী। নজরুল ইসলামও উপন্যাস লিখেছেন। বিষ্ণু দে এবং অমিয় চক্রবর্তী কখনো গল্প লিখেছেন কি না ঠিক জানি না—তবে, বিষ্ণু দে বিদেশী কাহিনীর অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একটি উপন্যাস শুরু করেছিলেন।

কানাঘুষোয় শুনতে পাই, জীবনানন্দ দাশ সম্পূর্ণ উপন্যাসই লিখেছিলেন এক সময়—যা এখনো অপ্রকাশিত আছে। তিনি গল্প একটি দুটি লিখতে শুরু করেছিলেন অনেক আগেই, তাঁর জীবন-মধ্যাহ্নে যে কোনো কারণেই হোক প্রকাশ করতে দেননি। প্রকাশিত হয় মৃত্যুর পর 'অমৃত' পত্রিকায়—এখন সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

কবি হিসেবে জীবনানন্দ সত্যকারভাবে আবিষ্কৃত হন ১৯৫০ সালের পর। তার আগে তাঁর কবিতাকে শুধু দুরূহ নয়, উদ্ভট আখ্যা দেওয়া হতো—আধুনিক কবিতার নিন্দার জন্য যে-কোনো রচনায় জীবনানন্দের উদ্ধৃতি ছিল অবধারিত। সজনীকান্ত দাস ও

প্রমথনাথ বিশীর দলবল তাঁকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করতে চেয়েছিলেন। সমসাময়িকদের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধদেব বসু প্রথম থেকেই চিনতে পেরেছিলেন এই কবির রচনাগুণ—তিনি অক্লান্তভাবে প্রবন্ধ লিখে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন এঁকে সেই আমলে—যখন জীবনানন্দকে অধিকাংশ লোক জীবানন্দ বলতো।

বুদ্ধদেব বসুর এই উদ্যম বিস্ময়কর হলেও তৎকালে জীবনানন্দকে পাঠক গ্রহণ করেন নি। আমাদের মনে আছে, আমাদের ছাত্র-জীবনে বিদগ্ধ বাংলার অধ্যাপকরা জীবনানন্দর কবিতা উদ্ধৃত করে হাস্য পরিহাস করতেন—আজকাল অবশ্য তাঁরাই অনেকে জীবনানন্দ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৫০-এর তরুণ কবি-সমাজ জীবনানন্দকে গ্রহণ করেন আপনজন হিসেবে—'বনলতা সেন', 'রূপসী বাংলা'র প্রকাশ আরও আলোড়ন তুলে দেয়। এখন জীবনানন্দ দাশ পঠিত এবং বহু পঠিত এবং কোনো কোনো মহলে পরিত্যক্ত।

জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কবিতায় একটি বিশাল স্তম্ভ—এ বিষয়ে আর কারুর কোনো দ্বিমত নেই। এই সব কবি এক একটি প্রতিষ্ঠানের মতন। এঁদের ব্যক্তিগত জীবন, চিঠিপত্র, টুকরো টুকরো রচনা—সবই এঁদের কবিতা আস্বাদনে সাহায্য করে। এই গল্পগ্রন্থটি সেই হিসেবেও গ্রহণ করা যেতে পারে।

জীবনানন্দ দাশের পক্ষে গল্প রচনা করা আমার কাছে কখনো খুবই বিস্ময়কর ঘটনা বলে মনে হয়নি। জীবনানন্দের বহু কবিতার মধ্যেই কাহিনীর উপাদান আছে। অনেক প্রাজ্ঞ সমালোচক অবশ্য মনে করেন যে কবিতার মধ্যে কাহিনীর আভাস কিংবা নাটকীয় উপস্থাপন বিশুদ্ধ শিল্পের অনুযায়ী হয় না—কিন্তু সেই সব প্রাজ্ঞ সমালোচকদের কলা দেখিয়ে পৃথিবীর ঢের মহৎ কবি—অধিকাংশ কবিই এরকম কবিতা রচনা করে গেছেন। জীবনানন্দের 'সময়' কবিতাটি উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত বলা যায়। 'আট বছর আগে' কিংবা 'সুবিনয় মুস্তফী' কবিতার চরিত্র নির্মাণ ছোট গল্পেরই তো সমধর্মী।

এই বইটিতে তাঁর যে তিনটি গল্প রয়েছে, 'ছায়ানট', 'গ্রাম ও শহরের গল্প' এবং 'বিলাস'—তাঁর ওই ধরনের কবিতা থেকে দূরে নয়। প্রথম গল্পটি খুবই সংক্ষিপ্ত—অন্য দুটিকে আকারের জন্যই গল্প বলতে হবে—কিন্তু ভাষা ও পর্যবেক্ষণে কবি জীবনানন্দকে নির্ভুল চেনা যায়—এবং সে পরিচয় আড়াল করার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও তিনি করেন নি। কবিতার মতনই এই গদ্যতেও অত্যন্ত কাব্যগন্ধী শব্দের পাশে তিনি খুবই বাজার চালু শব্দ আচমকা বসিয়েছেন। এই আচমকা বসানোই তাঁর গভীরতম কৃতিত্ব। যেমন, 'বিলাস' গল্পে তিনি কলকাতায় কলের জলের বর্ণনা দিলেন, 'হয়তো রসাতলবাহী পাইপের জলধারা রাতের নিস্তব্ধতায় মানুষের আধোঘুমের কানে ছলছলিয়ে চলকে ছলছলিয়ে কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন। না, তা নয়। তা যদি হতো, তা হলে কলকাতার মাটি ও দেয়ালের ভিতরের পাইপগুলোতে কত যে জলদেবী ধরা পড়ত। আধো-ঘুমন্ত মানুষের হৃদয় এমন নির্জন রাতে একজন দেবিকাকেই চায় তবুও—…"। এর একটু পরেই তিনি অম্লান বদনে লিখলেন, 'বাকি রাতটা কতগুলো হিজিবিজি ছাড়ছাড়াতে স্বপ্ন দেখলো সে।……ক্যাজা শরীরটা এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকবারও উপযুক্ত নয়……"।

'গ্রাম ও শহরের' গল্প নামক গল্পটি বিষয়ে আমরা এই বিভাগে আগেই আলোচনা করেছি—এখানে সাধারণভাবে বলা যায় মানুষের শারীরিক মিলনাকাঙ্ক্ষা তিনটি গল্পেরই পটভূমিকা হয়ে আছে।

গল্প তিনটির আলাদা তিনটি ভূমিকা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুনীলকুমার নন্দী এবং অমলেন্দু বসু। গ্রন্থটির প্রকাশনে অনেক রকম যত্নের উদ্যোগ আছে। কিন্তু তার ফলে খানিকটা চাপল্যও প্রকাশ পেয়েছে। এই ধরনের গ্রন্থে খানিকটা গাম্ভীর্যই মানায়।

"কবিতা লিখতে চেয়েছিলাম কৈশোরে।" এটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "প্রথম কবিতার কাহিনী" নামের কবিতার প্রথম লাইন। "পুতুল নাচের ইতিকথা" উপন্যাসের এক জায়গায় শশী আর কুমুদ বলাবলি করছে :

কবিতা লিখিস, অ্যাঁ ?

না, ঠিক মতন বাঁচতেই জানি না, কবিতা লিখব! লিখতে লজ্জা করে।

পরে আর একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "সাধ করলে কবি হয়তো আমি হতেও পারি ; কিন্তু ঔপন্যাসিক হওয়াটাই আমার আমার পক্ষে হবে উচিত ও স্বাভাবিক।"

সন্দেহ নেই, এই তৃতীয় মন্তব্যটিই অতিশয় সভা ও অবধারিত। বাংলা ভাষায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস চিরকালের সম্পদ হয়ে থাকবে, তাঁকে বাদ দিয়ে আধুনিক গন্ত সাহিত্যের কোনো রূপের কথা ভাবাই যায় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই আমাদের সাহিত্যে বলতে গেলে প্রথম লেখক, যিনি নির্মোহ সরল সত্যের সঙ্গে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও ভবিষ্যতের লড়াইয়ের কথা সার্থক সাহিত্যে রূপান্তরিত করতে পেরেছেন। তাঁর সাহিত্য জীবনে বেশ কয়েকটি পর্ব পার হয়েছেন, প্রতিটি পর্বেই তাঁর ভাষা ও রীতি আবেগমুক্ত, ঋজু এবং তীব্র। এবং একথাও ঠিক, কবির বদলে ঔপন্যাসিকের চরিত্রই তাঁর সমস্ত লেখায় অত্যন্ত স্পষ্ট।

কিন্তু কবিতার প্রতি একটা মমতাবোধ তাঁর আগাগোড়াই ছিল। অনেকেরই থাকে। শুধু কৈশোরেই কবিতা লেখার বাসনা নিবৃত্ত হয়নি, সারা জীবন ধরেই কবিতা রচনার অতৃপ্ত ইচ্ছে তাঁর থেকে

গিয়েছিল। এই বইয়ের ভূমিকা থেকে জানতে পারছি যে, দুটি কবিতার খাতা তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে একটিতে আছে তাঁর সত্যিই কৈশোরকালের কবিতা, যোলো থেকে একুশ বছর বয়সের মধ্যে রচনা। আশ্চর্যের বিষয়, এই খাতার একটি কবিতাও তিনি কখনো প্রকাশ করেননি। অর্থাৎ অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতিপরায়ণ সংবেদনশীল লেখকের মতনই তিনি রচনার সার্থকতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে প্রকাশ করতে চাননি। অন্য দিকে গদ্য রচনা সম্পর্কে তাঁর কোনো দ্বিধাই ছিল না। বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ফেলে লেখেন "অতসীমামী"র মতন প্রথম গল্প, এবং সরাসরি সেটা "বিচিত্রা"র সম্পাদকীয় দপ্তরে জমা দিয়ে আসেন।

দ্বিতীয় খাতাটিতে আছে তাঁর পরিণত বয়সের কবিতা, কিছু প্রকাশিত, কিছু অপ্রকাশিত। তাঁর ইচ্ছে ছিল একটি কবিতার বই বার করা—শেষ পর্যন্ত সেটা হয়ে ওঠেনি। বড় সাইজের কালো রঙের বাঁধানো খাতাটির নাম দিয়েছিলেন তিনি "ভাঁড়ার খাতা" ১লা আষাঢ় ১৩৫৩ থেকে সঞ্চয় শুরু। এই খাতায় বেশ কিছু কবিতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাজার খরচ ও সংসারের হিসেবও লিখেছেন। বাজার খরচের তালিকায় 'ড্রিঙ্ক'-এর উল্লেখও বাদ যায়নি। অর্থাৎ কবিতা ও জীবন-চর্যা তাঁর কাছে ছিল একই।

জীবিতকালে তাঁর কোনো কবিতার বই প্রকাশিত হয়নি—এতদিন বাদে যুগান্তর চক্রবর্তীর দক্ষ সম্পাদনায় প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কাব্য সংকলনটি হাতে পেয়ে যে-কোনো সাহিত্য অনুরাগীই অত্যন্ত খুশী হবেন। এ শুধু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসমাপ্ত বাসনা পূরণই নয়—এরকম একজন মহৎ লেখকের সমস্ত রচনাই, চিঠিপত্র, ডায়েরি ইত্যাদি যা-কিছু পাওয়া যায়, প্রকাশ করা উচিত এখন। শুধু গবেষকদের জন্যই নয়, আমার মতন বহু সাধারণ পাঠকও প্রিয় লেখকদের আদ্যোপান্ত রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে আগ্রহী।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতাকে স্পষ্ট বক্তব্যের বাহন মনে করতেন, কাব্যের রসগুণ তিনি স্বীকার করতেন না। শুধু তাই নয়, ঐ সংজ্ঞার ওপরে ছিল তাঁর জাতক্রোধ। শোনা যায়, তাঁর সমসাময়িক অনেক কবিকেই তিনি সহ্য করতে পারতেন না। একাধিক কবিতায় লিখেছেন :

"আমি কবি, শুঁড়ি নই।
শব্দ-মদ তৃষ্ণা নিয়ে এ লেখা পড়ো না।"
কিংবা আর এক জায়গায় :
"শব্দ-মদ বেচা শুঁড়িগুলো
কাব্যলক্ষ্মীর দেহ চিরদিন কচি রেখে দিল।
শুঁড়িগুলো সব মরে যাক্
কাব্যলক্ষ্মীর দেহে যৌবনের জোয়ার ঘনাক।"

শব্দ নয়, বক্তব্যই আসল, এবং এদিক দিয়ে বিচার করলে, তাঁর সব কবিতাতেই মোটামুটি বক্তব্য একটিই, পৃথিবীতে অবিচার-অত্যাচারের অবসান চাই। হয়তো এই বক্তব্য পৃথিবীর প্রায় সব কবিরই কবিতার বাহন, কিন্তু একে আলাদা আলাদা কাব্য সুষমায় সাজাবার জন্য কবিদের বৈশিষ্ট্য ও কাব্যরূপ তৈরী হয়ে ওঠে, তিনি সেটাই পছন্দ করতেন না। তবে এইটুকু বলা যায়, প্রথম জীবনে যখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য একলক্ষ্যে পৌঁছোয়নি, সেই সময়ও তিনি উপন্যাস গল্পে অসাধারণ শক্তিধর হলেও, কবিতা রচনায় কোনো দক্ষতাই আয়ত্ত করতে পারেননি। অর্থাৎ, ইচ্ছে করলেও তিনি শব্দ মাধুর্যময় কবিতা রচনা করতে পারতেন না। আশ্চর্যের ব্যাপার, তাঁর পুতুলনাচের ইতিকথা, চতুষ্কোণ, সোনার চেয়ে দামী, হলুদ নদী সবুজ বন প্রভৃতি উপন্যাসে এবং মাটির পা, ছোট বকুলপুরের যাত্রী প্রভৃতি গল্পে অনেক জায়গায় আশ্চর্য সূক্ষ্ম ও কবিত্বমণ্ডিত বর্ণনা থাকলেও, তাঁর অধিকাংশ কবিতাই গদ্যভারাক্রান্ত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত প্রিয় কবি ছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য। সুকান্ত সম্পর্কে তিনি একাধিক কবিতা লিখেছেন। এমনকি একথাও তিনি বলেছেন যে, যৌবনে নানা বিভ্রান্তি ও অস্থিরতার মধ্যে তিনি কবিতা লিখতে পারেননি—পরে দেখলেন, যা তিনি লিখতে চেয়েছিলেন, সুকান্তর কবিতার মধ্যেই তা প্রতিফলিত। ঐ কবি-কিশোরের ফুসফুস পোকারা ছিঁড়ে খেয়ে ফেললো বলেই তিনি আবার কবিতা লেখায় হাত দিলেন। তিনি লিখলেন: "শুধরে নিতে হবে অনেক গান। শিশির-ভেজা ঘাস বেঁচে থাক, বেঁচে থাক জীবনের রসঘন কবিতা।"

লেখকের জীবিকা কী হওয়া উচিত? এর একমাত্র উত্তর, কিছুই না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তা হয় না, যেহেতু প্রত্যেক লেখকেরই শরীর নামক একটা অবাধ্য ব্যাপার আছে এবং সংসার নামক একটি নাছোড়বান্দা সমস্যা আছে—সেই জন্যই তাদের একটা জীবিকার কথা ভাবতে হয়।

কেননা, শুধু লেখা থেকেই কারুর পেট ভরে না। পৃথিবীর সব দেশেই এক-এক যুগে অঙ্গুলিমেয় কয়েকজন লেখক শুধু নিজের গ্রন্থ থেকে উপার্জিত অর্থে জীবন কাটাতে পারেন। অর্থাৎ, বাংলা কথায় যাঁদের রচনাকে 'বেস্ট সেলার' বলে। এবং এ-কথা কে না জানে, যাঁরাই 'বেস্ট সেলার' লেখক হন, তাঁদের সাহিত্য-কৃতিত্ব সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধা কমে আসে।

যা-ই হোক, এক যুগের চার-পাঁচজন লেখকের সার্থকতা বাদ দিলেও বাকি লেখকদের জীবিকা কী হওয়া উচিত—এটা একটা গুরুতর প্রশ্ন। কারণ, সাহিত্য রচনা আসলে চব্বিশ ঘণ্টার কাজ—একজন লেখক দিনের পর দিন বা মাসের পর মাস এক লাইনও না লিখলেও তিনি আসলে সর্বক্ষণই সাহিত্য নিয়েই ব্যাপৃত থাকেন। তাঁর গতিবিধি ও ব্যবহারিক স্বাধীনতা অত্যন্ত জরুরি।

কিন্তু আগেই বলেছি, অধিকাংশ লেখককেই বাধ্য হয়েই কিছু না কিছু কাজ করতে হয়। এই কাজ বা চাকরি হয় সাধারণত স্কুল বা কলেজে শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা, রেডিও বা টেলিভিশনে কাজ অথবা বিজ্ঞাপন অফিসে কপি লেখা। এ ছাড়া কেরানীগিরি কিংবা

বিভিন্ন সরকারী সংস্থায় বিভিন্ন দায়িত্বে কর্মরত লেখকের সন্ধান পাওয়া যায়। আমি এমন কয়েকজন লেখককে চিনি যারা তাঁদের জীবনের সৃষ্টিশীল সময়ে ছিলেন ওষুধের গুদামে হিসাব রক্ষক, জীবন বীমার দালাল কিংবা প্রাইভেট টিউশানির যন্ত্র।

শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সব দেশেই প্রায় এরকম। আমাদের দেশে তো হবেই—এখানে অনেক কিছুই সীমাবদ্ধ—এখানে একজন সত্যিকারের সার্থক এবং জনপ্রিয় লেখকও একজন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর চেয়ে সচ্ছল নন। কিন্তু যে ইংরেজি ভাষার প্রচার বহুবিস্তৃত—সেই ভাষারও অধিকাংশ লেখকই কোনো না কোনো জীবিকার ওপর নির্ভরশীল। ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারদেরও লেখক হবার বাধা নেই—কিন্তু তাঁরা ব্যতিক্রম। যেমন ব্যতিক্রম ছিলেন আমাদের দেশে রাজশেখর বসু।

মৃত্যুর কয়েক মাস আগে টি এস এলিয়টের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য আমি বিব্রত বোধ করেছিলাম—কিন্তু দেখা যখন হয়েইছে তখন কিছু না কিছু বলা দরকার। সেইজন্যই আমি আচমকা প্রশ্ন করলাম, লেখকদের যদি জীবিকা নেওয়া খুবই দরকারি হয় তা হলে কোন্‌টা তাদের শ্রেষ্ঠ জীবিকা?

তিনি এক মুহূর্তও চিন্তা না করে বললেন, লেখকদের আর কোনো জীবিকা থাকা উচিত নয়।

অতি উত্তম কথা।

কিন্তু আমি জানতাম স্বয়ং এলিয়ট এক সময় ছিলেন ব্যাঙ্ক কর্মচারী এবং যে-সময়কার কথা বলছি, তখন তিনি ফেবার অ্যাণ্ড ফেবার কম্পানির অন্যতম পরিচালক। কথা হচ্ছিল সেই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের অফিস ঘরে বসেই।

আমি বললাম, আপনি এখানে একটা নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে আছেন। এখানে আপনাকে প্রতিদিন আসতে হয়।

তিনি সহাস্যে বললেন, আমি এখন বৃদ্ধ, আমার হাতে প্রচুর সময় এবং এ-কাজ আমার বেশ ভালো লাগে।

তিনি তৎকালীন তরুণ কবিদের কবিতার বই ছাপিয়ে দেওয়ায় তাঁর হস্তক্ষেপের কথাও কিছু বললেন। এবং তার পরেও জোর দিয়ে বললেন, তবু আমি মনে করি, তরুণ বয়সে অন্তত লেখকদের কোনো চাকরি করা উচিত নয়।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা আসে। চাকরি না করার দুটি দিক আছে। চাকরি করতে হয়, নিজের জন্যে অথবা সংসারের প্রয়োজনে। বিবাহিত হলে তো কথাই নেই—বিবাহিত না হলেও অনেক লেখককেই নিজ সংসারের দায়িত্ব নিতে হয়। নিজের জন্য যে-কোনো কষ্ট সহ্য করা যায়—কিন্তু সংসারের অন্য সকলকে কষ্টে রাখার যৌক্তিকতা কতখানি? কোনো লেখক হয়তো স্বার্থপরের মতন সংসার ত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু তার খুব সুফল হয় না। দয়া ও করুণা—এই দুটি ধর্ম সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য—নিজের জীবনে এ দুটি বাদ দিয়ে যাঁরা সাহিত্য রচনা করতে চান—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় অকালমৃত্যু তাঁদের নিয়তি।

নিজের জন্য কষ্ট সহ্য করার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। সংসারমুক্ত অনেক লেখকের কথা আমরা জানি, যারা জীবনে বহু-রকম কষ্ট সহ্য করেছেন, দিনের পর দিন অনাহারে পর্যন্ত কাটিয়েছেন এবং সাহিত্যের অমূল্য ফসল দিয়ে গেছেন আমাদের জন্য। কিন্তু দারিদ্র্য কোনো নিয়ম নয়—দারিদ্র্যে সাহিত্য সৃষ্টি হতেও পারে, নাও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দারিদ্র সহ্য করতে হয়নি—এজন্য তিনি বঞ্চিতও হননি কিছু থেকে। গোর্কিকে দারিদ্র সহ্য করতে হয়েছে। আবার বহু দরিদ্র এবং বহু ধনী আছেন, যাঁরা সাহিত্য রচনার আপ্রাণ চেষ্টা করেও কিছুই লিখতে পারেননি।

আসলে লেখকের মনের মধ্যে একটা নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। তিনি যে পরিবেশেই থাকুক না কেন—তিনি তার সঙ্গে নিজেকে

মানিয়ে নিতে পারেন না। চাকরি বা সংসার বা সম্মান সভা—সব জায়গাতেই তিনি নিজেকে অনুপযুক্ত মনে করেন। এই জন্যই দেখা যায়, অনেক লেখকের মধ্যেই খুব ভ্রমণস্পৃহা থাকে। সুযোগ পেলেই তাঁরা বেরিয়ে পড়েন। সুযোগ না পেলেও তাঁরা সব সময়েই ভ্রাম্যমাণ।

লেখকের জীবন ঠিক কীরকম হয়, তা আর কারুর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কেননা লেখক মাত্রই বৈরী নাগা, অর্থাৎ তারাও আত্মগোপনকারী। তাদের দেখলে চেনা যায় না। শাস্ত্রে যদিও বলেছে যে, অসার এই খলু সংসারে কবিরাই প্রজাপতি। কিন্তু এই প্রজাপতিদের চরিত্র অতি বিচিত্র। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, 'কবিকে খুঁজো না কবির জীবনচরিতে।'

রবীন্দ্রনাথের অনেক উপদেশ আমি মানি, কিন্তু উপযুক্ত নির্দেশটি আমি মানতে পারিনি। আমার বরাবরই মনে হয়, একজন লেখক বা কবির রচনা পুরোপুরি বুঝতে হলে সেই মানুষটিকেও জানা দরকার। এই জন্যই লেখক-কবিদের জীবনীগ্রন্থ পাঠ করার ব্যাপারে আমার অসীম আগ্রহ। তিন-চারখানি বইয়ের মধ্যে ঐ রকম একটি বই পেলে প্রথমেই পড়ি।

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের কোনো লেখকের সে-রকম উত্তম জীবনী আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি। সম্পূর্ণাঙ্গ জীবনী আছে, কিন্তু আসল মানুষটির কথা কেউ লিখতে চান না। মাইকেলের জীবনী কত নাটকীয় ছিল। এতই নাটকীয় যে এঁর জীবনী রীতিমতন মঞ্চসফল নাটক পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু ঐ ঘটনাগুলিই মাইকেলের প্রকৃত জীবনী—এরকম আমার বিশ্বাস হয় না। মাইকেল কি নাটকের নায়ক ছিলেন, না একজন দুঃখী সাধারণ মানুষ ছিলেন?

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বিরচিত রবীন্দ্র-জীবনী একটি বহু পরিচিত গ্রন্থ। গ্রন্থটি পড়ে প্রকৃত আনন্দ পেয়েছিলাম। কিন্তু

ঐ গ্রন্থ সম্পর্কেও এরকম কথা কেউ কেউ বলেছেন যে, ওখানা কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনী নয়, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রের জীবনী। আমি অবশ্য ঐ মন্তব্য মানি না। আমার মনে হয়, ঐ ধরনের কথা নেহাত নিন্দার জন্যই নিন্দা। রবীন্দ্রনাথকে বুঝবার জন্য ঐ বইটি একটি অপরিহার্য আকর গ্রন্থ। তবে, এ-কথাও ঠিক, কবি রবীন্দ্রনাথ ঐ ধরনের গ্রন্থে প্রায় প্রথম থেকেই মহাপুরুষ। সংশয় ও দ্বিধায় আচ্ছন্ন একজন কবিকে ঠিক চেনা যায় না।

লেখকদের আত্মজীবনীও ঠিক নির্ভরযোগ্য নয়। লেখকরা নানা ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করতে করতে অভ্যাসবশত নিজেকেও একটি আলাদা ধরনের চরিত্র তৈরি করেন। রুশো তাঁর স্বীকারোক্তিতে অনাথ আশ্রমের কাউন্টারে একটি অবৈধ সন্তানকে বসিয়ে যখন বলেন, 'এই আমার চাঁদা'—আজ সেটা খুব উত্তেজক হলেও আমরা বুঝতে পারি, এটা একটা ঘটনা মাত্র, এটা কোনো লেখকের প্রকৃত জীবনীর অংশ নয়। আবার, নবীনচন্দ্র সেনের খণ্ডে-খণ্ডে বিভক্ত 'আমার জীবন' পড়লে মনে হয় একটি রম্য উপন্যাস পড়ছি—এতে লেখককে কবি বলে চেনা যায় না, বরং নিশ্চিত ধারণা হয়, একজন হামবাগের লেখা এই বই।

লেখকদের ভালো জীবনী প্রকাশিত হওয়া উচিত বাংলায়। এবং সে-কাজ লেখকদের নিজেদের দ্বারা ঠিক হবে না—এ-জন্য সত্যনিষ্ঠ গবেষকদের প্রয়োজন। নজরুলের কয়েকজন বন্ধু এবং—তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিরা অনেকেই এখনো জীবিত—এখনও কি নজরুল ইসলামের একটি প্রকৃত জীবনী প্রকাশের সময় হয়নি? এর পর বড্ড দেরি হয়ে যাবে যে। যেমন জীবনানন্দ দাশ। আমরা শুনেছি ক্লিনটন সিইলি নামে একজন মার্কিন যুবক জীবনানন্দের জীবনী নিয়ে গবেষণা করা প্রায় শেষ করে এনেছেন। কিন্তু সুদূর আমেরিকা থেকে একজন অধ্যবসায়ী যুবকের পক্ষে যত তথ্য আহরণই সম্ভব হোক না কেন, বাংলায় তার আগে জীবনানন্দ

দাশের সম্পূর্ণ তথ্যপূর্ণ জীবনী কি এর মধ্যেই প্রকাশ করা যেত না? বাংলাতে দু-তিনটি বই বেরিয়েছে ঠিকই—নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও কোনোটিই সম্পূর্ণ কাজ নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বহুকাল পরিচিত একজন ব্যক্তিকে আমি এ-প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন, মানিকবাবুর ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজন অনেকে এখনো বেঁচে আছেন তো। সুতরাং আরও কিছুদিন সময় যাক।

এ-উত্তর শুনে আমি অবাক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি চোর ডাকাত বা পাপী ছিলেন নাকি যে তাঁর সম্পর্কে এত লুকোচাপা করতে হবে? আমি যতদূর জানি, মানিকবাবু ছিলেন এক দুর্ধর্ষ পুণ্যাত্মা পুরুষ। তাঁর মৃত্যুর পর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে—এখনো ঠিকমতন কাজ শুরু না হলে, আমরা অনেক কিছু হারাবো।

আর একটি উদাহরণ, অতুলপ্রসাদের জীবনী। ইদানীং কালে মানসী মুখোপাধ্যায় এবং কল্যাণকুমার বসু রচিত অতুলপ্রসাদের দুটি আলাদা স্বাদের মূল্যবান জীবনী বেরিয়েছে। সেই বই দুটো পড়ে, অনেকেই প্রথমে বিচার করেন, অতুলপ্রসাদের জীবনের সব কথা আছে তো? অতুলপ্রসাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অবহিত এমন অনেক লোক এখনো জীবিত—লোকমুখেও অনেক কিছু প্রচারিত—কিন্তু ছাপার অক্ষরে সেগুলোর পরিচয় বা প্রত্যাখ্যান দেখা যায় না।

আমরা কানাঘুষোয় শুনেছি যে উনি মদ্যপায়ী ছিলেন কিংবা উনি নারীদের প্রতি খুব আসক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনী পড়লে মনে হয়, তিনি যেন একটি ধোয়া তুলসীপাতা। অর্থাৎ, উপন্যাসে আমরা একটি মদ্যপ চরিত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারি, (যেমন দেবদাস) অবৈধ প্রণয়-সম্পর্ক পছন্দ করতে পারি, (যেমন রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' কিংবা 'দুই বোন') কিন্তু কোনো লেখকের ব্যক্তিগত জীবনে ঐ ধরনের ঘটনা আমরা প্রকাশ্যে স্বীকার করতে

রাজি নই। বিপ্লবীদের যেমন বিয়ে করা একটা অপরাধ—লেখক-দেরও তেমনি যেন সকল প্রকার সামাজিক মহত্ত্ব থেকে বিচ্যুত হওয়া অপরাধ। সাধে কি আর লেখকরা পাঠকদের জড় পদার্থ ভাবে?

লেখকদের পক্ষ থেকেও অপরাধ আছে। হেনরি মিলার একজন সর্বজননিন্দিত অশ্লীল লেখক। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে যখন মামলা ওঠে, তিনি আদালতে এই এজাহার দেন যে, মানুষ হিসেবে তিনি তাঁর রচনায় বর্ণিত জীবনের সঙ্গে জড়িত নন্। তিনি পিতা হিসেবে আদর্শ, পারিবারিক মানুষ হিসেবে স্বাভাবিক, তাঁর পাড়াপ্রতিবেশীরা তাঁকে সম্মানজনক নাগরিক বলে মনে করেন। তা হলে, প্রশ্ন জাগে, হেনরি মিলার যে-জীবনের কথা তাঁর উপন্যাসে লিখেছেন—সে সম্পর্কে তাঁর কি কোনোই অভিজ্ঞতা নেই? সবই বানানো? এ কি চালাকি নাকি? আঁদ্রে মালরো একজন সর্বসম্মানিত লেখক, ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক মন্ত্রী ছিলেন ইত্যাদি। তাঁর প্রথমা পত্নী একটি স্মৃতিকথায় লিখলেন যে আঁদ্রে মালরো যৌবনে দূর প্রাচ্যে থাকবার সময় ছিলেন মূর্তি-চোর এবং ভ্যাগাবন্ড। আঁদ্রে মালরো অতি দ্রুত
হ।
কথার প্রতিবাদ করে ছিলেন। ঠিক আছে, আমরা মেনে নিলাম।
তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কী সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন যাতে তাঁর
এবং যে
ন দোষারোপ করে? ডিলান টমাসের স্ত্রীর লেখাটিও এ-প্রসঙ্গে
সত্যনি
যোগ্য। ইংরেজীতে একটা কথা আছে শয়ন কক্ষের ভৃত্যই
এবং—
র মানুষের শ্রেষ্ঠ জীবনীকার। কিন্তু লেখকদের স্ত্রী সম্পর্কেও
এখনও
ন হবার ব্যাপার আছে।
হয়নি
আম?
জীব
কিন
ব

এক বন্ধুর বাড়িতে বইখানা দেখে চমকে উঠলাম। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালীর ইতিহাস'। সত্যিই আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি, পুনরায় মনে হলো। আমাদের প্রথম ছাত্র-বয়েসে বইখানি যখন নতুন প্রকাশিত হয়েছিল, তখন মন দিয়ে পড়িনি। পঁচিশ টাকা দাম, সে-সময়ে কেনার প্রশ্নই উঠতো না, লাইব্রেরি থেকে দু' তিনবার এনেও চাঞ্চল্যবশত সম্পূর্ণ পড়া হয়ে ওঠেনি একবারও। এখন বইখানি দেখে মনে পড়লো, জীবনের কত কাজ বাকি থেকে গেছে। বন্ধুপত্নীর সামান্য আপত্তি সত্ত্বেও বইখানা ধার নিয়ে চলে এলাম।

বাঙালী জাতির এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে বাঙালীর সম্পূর্ণ ইতিহাস পাঠ করার চেয়ে বড় কাজ আর কী থাকতে পারে। নীহাররঞ্জনের রচনা যদিও বাঙালীর ইতিহাসের আদিপর্ব মাত্র, তবু এই বৃহদায়তন গ্রন্থটিতে এমন সামগ্রিক ভাবে আমাদের জাতি ও সংস্কৃতির মিশ্র রূপটির কথা বলা হয়েছে যাতে নিজেদের চিনতে আর অসুবিধা হবার কথা নয়। পৃথিবীর যে-কোনো দেশে, যে-কোনো ভাষায় এরকম একটি ইতিহাসগ্রন্থ গর্ব করার মতন।

নীহাররঞ্জন 'বাংলার ইতিহাস' লেখেননি, লিখেছেন 'বাঙালীর ইতিহাস'। এই প্রভেদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস বলতে রাজা-রাজড়ার বংশানুক্রমিক কাহিনীতেই আমরা অভ্যস্ত। এ যাবৎ অন্যান্য যে-সমস্ত বাংলার ইতিহাস বেরিয়েছে, তাতে ঐ বংশ-পরিচয়ই প্রাধান্য পেয়েছে। অথচ রাজা বা রাষ্ট্র ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় কখনো একান্ত হয়ে ওঠেনি। দুশো বছর আগে পর্যন্ত আমাদের দৈনন্দিন জীবন ছিল একান্ত ভাবেই সমাজকেন্দ্রিক। রাজবংশের উত্থান-পতনে

কিছু-কিছু বিপর্যয় এসেছে মাত্র, আমাদের জাতীয় চরিত্রে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়নি। ভৌগোলিক ভাবেও বাংলাদেশ বা বঙ্গভূমি বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থায় সঙ্কুচিত হয়েছে বা প্রসারিত হয়েছে—কিন্তু সে-কাহিনীকে বাঙালী জাতির রূপ বলা যায় না। সমাজের বিভিন্ন স্তর ও রীতির মেলামেশার ফলে এই ভূমির সর্বসাধারণ মানুষের যে ইতিহাস সেটাই প্রকৃত ইতিহাস। আগেকার অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থে কিছু-কিছু সামাজিক অবস্থার কথাও যখন বলা হয়েছে, তখন সে শুধু বর্ণাশ্রমবদ্ধ সমাজ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বা উচ্চতর বর্ণের সামাজিক রীতিনীতি—সমগ্র ভাবে বাঙালীর জীবনে যার স্থান অত্যন্ত সীমিত। ধর্ম বা শিল্প সাহিত্যের যে পরিচয় আমরা এতকাল পেয়েছি তাও রাজসভা আশ্রিত বামুন বা বনিকের তৈরী—বাংলার বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে যার সম্পর্ক খুব কম। লোকধর্ম, লোকশিল্প, লোক-সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের ইতিহাসের সম্পর্ক যাচাই হয়নি। নীহাররঞ্জন লিখেছেন বাঙালী জাতির সেই ব্যাপক সামাজিক ইতিহাস। তাই এই বইয়ের এক অধ্যায়ে রাজবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে বটে, কিন্তু বাকি চোদ্দটি অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে বর্ণবিন্যাস, শ্রেণী বিন্যাস, গ্রাম ও নগর বিন্যাস, দৈনন্দিন জীবন, ধর্মকর্ম ও ধ্যানধারণা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা প্রভৃতি। এ এক নতুন ধরনের ইতিহাস।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক কাল আগে রমেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসও একটি মূল্যবান গ্রন্থ। তারও আগে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন বাঙ্গালার ইতিহাস। পরবর্তী কালে বাংলার ইতিহাসের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু বই। কিন্তু নীহাররঞ্জন রায়ের বইটির তথ্যসম্ভার যেমন বিপুল ও বিস্ময়কর, তেমনই এর প্রসাদ গুণ। বইখানি সম্পূর্ণভাবে সাহিত্য রসাশ্রিত—এত সব ছোটখাটো খুঁটিনাটি তথ্য ও তার বিচার-বিশ্লেষণ যে এমন সাহিত্যমণ্ডিত ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তা না পড়লে বিশ্বাস করা যায় না। ভূমিকায় যদুনাথ

সরকার সেই কথাই বলেছেন, "ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের দিক হইতেও সমগ্র বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে ইহা একটি অনন্যপূর্ব গ্রন্থ। ইতিহাস-বিষয়েই শুধু নয়, সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এত বিশদ, এত পূর্ণাঙ্গ, এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ইহার পূর্বে কেহই লেখেন নাই।" এই বিশাল গ্রন্থটি রচনার কারণ হিসেবে লেখক বলেছেন: "জ্ঞানস্পৃহা আমাকে এই গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত করে নাই। প্রথম যৌবনে প্রাণের আবেগে এবং স্বদেশব্রতের দুর্দম নেশায় বাংলার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আমাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। তখন বিস্তৃত বাংলার কৃষকের কুটিরে, নদীর ঘাটে, ধানের ক্ষেতে, বটের ছায়ায়, শহরের বুকে, পদ্মার চরে, মেঘনার ঢেউয়ের চূড়ায়, এই দেশের এবং এই দেশের মানুষের একটি রূপ আমি দেখিয়াছিলাম এবং তাহাকে ভালোবাসিয়াছিলাম। এই ভালোবাসার প্রেরণাতেই আমি এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম—ভালোবাসাকে জ্ঞানের বস্তুভিত্তিতে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে··।" এবং এই বইয়ের রচনা শুরু হয়েছিল দেশ বিভাগের আগে। এখন আমাদের ও বাংলাদেশের নাগরিকদের কাছে সমান ভাবে আকর্ষণীয়।

লোকমুখে শুনতে পেলাম, এই বই এখন ছাপা নেই, পাওয়া যায় না। এটা একটা অবিশ্বাস্য অন্যায় ঘটনা। এই দায় কার, লেখক না প্রকাশক বা সরকারের তা জানি না। এক সময় এই বইয়ের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরি করেছিলেন জ্যোৎস্না সিংহ রায় এবং ছোটদের জন্য একটি সংস্করণ প্রস্তুত করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সেগুলোও পাওয়া যায় কি না বলতে পারছি না।

নয় শত পৃষ্ঠার এই বিরাট গ্রন্থে বাঙালীর শুধু আদি পর্বের কথা আছে। ভূমিকায় যদুনাথ সরকার লিখেছেন, "নীহাররঞ্জন অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। আশীর্বাদ করি, ভগবান তাঁহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাকে সেই ক্ষমতা দান করেন, যাহার বলে তিনি বাকি

দুই যুগের (মুসলিম ও ইংরাজ যুগ) ইতিহাসও এমনই সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধরূপে রচনা করিতে পারেন।” নীহাররঞ্জন কিন্তু গুরুর এই আশা রক্ষা করেননি। বাকি দুটি পর্ব তিনি রচনা করেননি। তিনি এখন কী করেন আমি জানি না, শুনেছি দিল্লী প্রবাসী হয়ে ভারত সরকারের কী সব বৃহৎ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত। আমাদের অনুরোধ সে-সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে তিনি বাংলা ভাষায় বাঙালী জাতির ইতিহাস সম্পূর্ণ করুন। নীহাররঞ্জন যদি স্বেচ্ছায় লিখতে না চান, তবুও তাঁকে দিয়ে জোর করে লেখাবার একটি উপায় আছে। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: একবার তিনি রাজরোষে কারারুদ্ধ হন। জেলখানায় সেই নির্বাধ অবসরে তিনি এই বইয়ের মূল কাঠামোর দশটি অধ্যায় লিখেছিলেন। তাহলে এখন যে-কোনো ছলছুতোয় নীহাররঞ্জন রায়কে আবার কারারুদ্ধ করা উচিত।

সব দেশেই উপন্যাস পাঠের আগ্রহ সব চেয়ে বেশী। ব্রিটেনের পাঠকদেরও। কিছুদিন আগে লণ্ডনের 'সোসাইটি অব ইয়ং পাবলিশার্স' একটি অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন, তাতে দেখা গেছে, পাঠক-পাঠিকাদের আগ্রহ অনুযায়ী, উপন্যাসের স্থান প্রথম। উপন্যাসের পরেই স্থান—যুদ্ধ, অ্যাডভেঞ্চার বা আজকালকার ডিটেকটিভ কিংবা গুপ্তচরদের কাহিনীগুলির। জীবনী, স্মৃতিকথা, ভ্রমণ-বিবরণ ইত্যাদির স্থান এর পরপর। ষষ্ঠ স্থান, হাসির গল্প বা রসিকতার সংকলনের। সপ্তম, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব।

এর উল্টোপিঠটা এবার দেখা যাক। বেশী লোক নভেল পড়ে, তাই নভেলের বেশী কপি ছাপা হয়। কিন্তু তা বলে, দেশ জুড়ে শুধু উপন্যাস ছাপার কৃত্রিম উত্তেজনা শুরু হয়নি। এক বছর ব্রিটেনে বই ছাপা হয়েছে ২৮ হাজার ৮ শো ৮৩ খানা। তার মধ্যে, 'সাহিত্য' জাতীয় গ্রন্থ মাত্র ৯১২ খানা—এর মধ্যেই উপন্যাস, রহস্য, ভ্রমণ ইত্যাদি সব কিছু পড়ছে। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে ছাপা হয়েছে ১ হাজার ২ শো ২৬ খানা বই; ১৩১৯টি ছাপা হয়েছে ধর্ম ও অধ্যাত্ম দর্শনের বই, রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কিত বই ১৭২০টি।

এর সঙ্গে তুলনা করুন বাংলা দেশের অবস্থা। উপন্যাস, উপন্যাস আর উপন্যাস—এ-ছাড়া কোনো কথা নেই। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান কিংবা ইতিহাস সম্পর্কে (স্কুল-কলেজ পাঠ্য বাদ দিলে) কোনো বই ছাপাতে গেলে আজ যে-কোনো বাঙালী লেখককে প্রাণান্ত হতে হবে, কিংবা নির্ঘাত নিজের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কিংবা স্ত্রীর

আলমারায় জলাঞ্জলি দিতে হবে। যে-কোনো প্রখ্যাত প্রকাশকের গ্রন্থ তালিকা দেখুন, উপন্যাস ছাড়া অন্য প্রকার বই কখানা আছে! এর বিষময় ফল, বাংলা ভাষা যাঁরা লিখতে জানেন—তাঁরা সবাই উপন্যাস লিখতে ঝুঁকেছেন। সমালোচক এখন নিজস্ব কাজ ছেড়ে সমালোচনার অযোগ্য উপন্যাস লিখছেন, কবিরা কবিতা লেখা ছেড়ে উপন্যাস লেখার অপচেষ্টা করে সময় ক্ষয় করছেন, যাঁর লেখার কথা ভ্রমণ-কাহিনী তিনি লিখছেন ভ্রমণ-উপন্যাস, আদালত কিংবা জেলখানার কেস হিসট্রিগুলোকেও শুধু কেস হিসট্রি হিসেবে লিখলে চলে না, উপন্যাস বানাতে হয়। ডাক্তাররা পর্যন্ত রোগী-রোগিণীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন উপন্যাস লিখে।

ও-দেশের সঙ্গে আমাদের এই তফাতের কারণ বই পড়ার অভ্যেসের তফাৎ। ব্রিটেনে যাঁরা বেশী উপন্যাস পড়েন, তাঁরা যে শুধুই উপন্যাস পড়েন—তা নয়। সময় পেলেই কিছু একটা পড়া ওঁদের মজ্জাগত স্বভাব। ট্রেনে, বাসে, কারুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অপেক্ষা করার সময়, এমনকি দাঁত তোলার আগে ওয়েটিং রুমে—কিছু-না-কিছু পড়া একটা জাতীয় স্বভাব। এইজন্য খবরের কাগজগুলির বিক্রী অসাধারণ; একজন অপরের কাছে 'একটা শীট দিন তো স্যার' বলেন না। ছুটির দিনগুলো উপন্যাস পড়ার জন্য ধার্য, দূর যাত্রার ট্রেনে রহস্য কাহিনী, এইভাবে কিছু কিছু অন্যান্য বই পড়ারও সময় হয়ে যায়। যে উপন্যাস পড়ে, সে দেশের কবিতা বা বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে কিছুই জানে না—এগুলো অস্বাভাবিক। লাইব্রেরী থেকে বই আনার অভ্যেস প্রায় সকলেরই! অন্যদিকে আমাদের দেশের শিক্ষিত পুরুষদের লাইব্রেরীর সঙ্গে যোগাযোগ খুব কম। বহু শিক্ষিত পরিবারে মাসের পর মাস একটিও বই আসে না। অনেক ক্ষেত্রেই লাইব্রেরী থেকে চাকর বা বাড়ির ছেলেদের দিয়ে বই আনান বাড়ির মেয়েরা, দুপুরের জন্য। যে-কোনো বই, অর্থাৎ যে-কোনো উপন্যাস বা টানা গল্প। এমনকি ছোট গল্প দেখেও তাঁরা বিরক্ত হন,

ইতিহাস বা দর্শনের কথা দূর অস্ত। এই সব গৃহস্থ বধূ কিন্তু আগেকার সেই বৃত্তি পরীক্ষা পর্যন্ত পড়া মেয়েরা নন, ভিলাই-দুর্গাপুর-রাউরকেল্লা-সিন্ধ্রী-কলকাতার হাজার হাজার অফিসারদের স্ত্রীরা আজকাল অন্তত সিনিয়ার কেম্ব্রিজ বা স্কুল ফাইন্যাল পাস, তাঁরা সবাই ইংরেজী সিনেমা দেখেন, এবং অন্তত খানদশেক রবীন্দ্র সঙ্গীত জানেন, তাঁরা সবাই আধুনিকা, এমনকি 'ওয়োম্যান অ্যাণ্ড হোম' জাতীয় ম্যাগাজিন দেখে তাঁরা ঘর সাজান, কিন্তু বই ছোঁন না, ছুঁলেও শুধু উপন্যাস। তাঁদের স্বামীরা ক্লাবে বা তাসের আড্ডায় কোনো হাল্কা মাসিক-পত্রিকা উল্টেই বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে যান। এঁরাই যখন কোনো অবাঙালী বন্ধুর সঙ্গে গল্প করবেন. তখন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে গদগদ হয়ে উঠে ঘোষণা করবেন, বাংলা সাহিত্য এখনো ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ, এমনকি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ, আওয়ার পোয়েট টেগোর—ইত্যাদি। অথচ লাইব্রেরীগুলোর দুর্দশা চোখে দেখা যায় না!

ব্রিটেন অতটুকু দেশ, জনসংখ্যা আমাদের চেয়ে কত কম। কিন্তু সে দেশে ১ কোটি ৮০ লক্ষ লোক নিয়মিত লাইব্রেরী থেকে বই আনেন পড়তে। লাইব্রেরীতে সমগ্র বইয়ের সংখ্যা ৮ কোটি। দূর গ্রামাঞ্চলের জন্যও ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী আছে ৩৫০টা। প্রত্যেকটি স্কুলে লাইব্রেরী থাকা আবশ্যক। এ-ছাড়া ব্যক্তিগত সংগ্রহ। বই কেনা এবং উপহার দেওয়া— সামাজিকভাবে বেঁচে থাকার অঙ্গ।

বই পড়ার অভ্যেসেরও পাঠকের অবস্থা অনুযায়ী তারতম্য আছে। যাঁরা ১৬ বছর বয়েসের আগেই স্কুল ও লেখাপড়া ছেড়েছেন, ব্রিটেনে যাঁদের প্রায় অশিক্ষিতই বলা যায়, তাঁদের শখের তালিকায় বই পড়ার স্থান চতুর্থ এবং উপন্যাসই বেশী পড়েন। যাঁরা ১৯ বছরেরও পরে কলেজে যাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে এই পড়ার অভ্যেস অনেক বেশী, এবং এঁরা মোটামুটিভাবে দর্শন, ধর্ম, কবিতা এবং নাটকের বইয়ের সম্পর্কে খবর রাখেন।

তুলনা করুন, আমাদের দেশের বি.এ পাস ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। স্কুল কলেজের বাইরে ক'জন ওসব বিষয়ে আলাদা বই পড়েছেন? এমনকি, শিক্ষক-অধ্যাপকদের অবস্থাও জানি, ইংরেজির শিক্ষক খবর রাখেন না বাংলা সাহিত্যের, ভূগোলের শিক্ষক পড়েন না ভ্রমণ কাহিনী, ইতিহাসের বই পড়া অবান্তর মনে করেন। বিজ্ঞানের শিক্ষকদের কথা তো সাধারণভাবে বাদই দিচ্ছি। পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ছিলেন সাহিত্যে আসক্ত, আর এখন বিজ্ঞানের ছাত্র-অধ্যাপকের কাছে সাহিত্য অস্পৃশ্য। আমার কোনো বন্ধু—এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের অধ্যাপক, তিনি একদিন "সঞ্চয়িতার" পাতা ওল্টাচ্ছিলেন, আমি প্রশ্ন করেছিলুম, কি রে, কী বই পড়ছিস? তিনি গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন, আর্টসের বই পড়ছি।

বই পড়ার অভ্যেস প্রসঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। দুঃখ-দুর্দশার দিনেই মানুষের বেশী বই পড়তে ইচ্ছে হবার কথা। সামর্থ্য? মাসে দু'এক টাকা চাঁদা দিলে যে-কোনো লাইব্রেরী থেকে প্রতিদিন একখানা বই পাওয়া যায়। প্রতি পরিবারে যদি একজন দু'জন লাইব্রেরীর সদস্য হতেন, তাহলে বাংলা দেশের লাইব্রেরীগুলো এবং পুস্তক প্রকাশনার রূপ অন্যরকম হতো।

ভ্রমণ-কাহিনী সম্পর্কে রুচির ব্যবধানটাও কৌতূহলজনক। আমাদেব দেশের ভ্রমণ-কাহিনীগুলো কেন এখন ভেজালে ভর্তি, হিমালয়ের চূড়াতেও কেন বালিগঞ্জের সংলাপ এবং তরুণী মেয়ের ন্যাকামির রগরগে গল্প থাকছে, আর কেন ওদের ভ্রমণকাহিনীগুলো এখনো অমলিন ও সরস। আমাদের দেশের পাঠক ভ্রমণকাহিনীতে চাইছেন অবরুদ্ধ বাসনা মেটাতে, যেখানে নিজের কোনোদিন যাবার সাধ্য নেই, গ্রন্থের মধ্য দিয়ে সেখানে ঘুরছেন—সুতরাং লেখকও পঙ্গু পাঠকের কল্পনার জন্য সবকিছুর ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, কী সুন্দর প্রকৃতি, আর সুন্দরী মেয়েদের কটাকট প্রেম। কিন্তু, ওঁরা

ভ্রমণকাহিনী লেখেন—সত্যি সত্যি অপরকে সে-দেশে বা অঞ্চলে যাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করার জন্য। তাই বিবরণ হয় যথাযথ। ও-দেশে সাধারণত তরুণ-তরুণীরাই ভ্রমণকাহিনী বেশী পড়েন, যখন-তখন যাঁরা দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তে পারেন, এবং ধনী ব্যক্তিরা। ৬৫ বছর পার হয়ে গেলে আর সাধারণত ওঁরা কেউ ভ্রমণকাহিনী পড়তে চান না।

[বাংলায় উপন্যাসের এত রবরবা দেখে অনেকেই এখন ফাঁকতালে ঔপন্যাসিক হতে চায়। তাদের জন্য উপন্যাস লেখার একটি গোপন ফর্মুলা আমি এখানে ফাঁস করে দিচ্ছি।]

"(বিশেষ গোপনীয়)"

লেখার জনপ্রিয়তা বাড়াইবার জন্য কী কী করিবেন।

(ক) একটি গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক ঘটনা গল্পেব ভিতর ঢুকাইয়া দিবেন।

(খ) খানিকটা রাজনীতি (ফিকা গোছের) গল্পের ভিতর যেন স্থান পায়।

(গ) সাধারণ-বুদ্ধিতে অবিশ্বাস্য বা অসম্ভাব্য মনে হইলেও স্থূল নাটকীয় উপাদান বহুল পরিমাণে গল্পের ভিতর দিতে ভুলিবেন না।

(ঘ) শোষক ও শোষিতের সংঘর্ষের কথা যেমন করিয়া হউক গল্পের ভিতর আনিতে চেষ্টা করিবেন।"

প্রশ্ন : পাঠক বলুন তো, কোন্ বিখ্যাত বাঙালী লেখকের একটি বইয়ের শেষ পাতায় এই কথাগুলো আছে ?

সূত্র : এই কথাগুলো কৌতুক করে লিখেছিলেন এমন একজন বাঙালী লেখক যিনি নিজে সারা জীবনে নিজের রচনায় এর একটিও ব্যবহার করেননি, যিনি জনপ্রিয়তার যে কোনো সুলভ প্রচেষ্টা থেকে চিরকাল দূরে ছিলেন।

এটা ধাঁধা নয়, সুতরাং উত্তর পাঠাবার কোনো দরকার নেই। যিনি জানেন, তাঁর পক্ষে মনে মনেই জেনে রাখা ভালো।

কমলকুমার মজুমদার খুব বিখ্যাত ব্যক্তি নন, জনপ্রিয় নন মোটেই। তবু কয়েকটি ছোট ছোট গোষ্ঠীতে ইতিমধ্যেই তিনি প্রায় প্রবাদ-প্রসিদ্ধ পুরুষের মতন। তাঁর কথাবার্তা, তাঁর জীবনযাপন এবং জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি—এগুলি সবই এই সব গোষ্ঠীর আলোচ্য বিষয়। এক হিসেবে বলা যেতে পারে তিনি যেন সাহিত্য-আন্দোলনের এক গুপ্ত দলের নেতা, যদিও নেতৃত্ব করার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা এঁর নেই।

রেনেশাঁস আমলের মানুষের মতন তাঁর চরিত্রে বহু গুণের সমাবেশ। আমরা যতদূর জানি তিনি স্কুল-কলেজী শিক্ষায় কখনো আগ্রহী হননি, কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যমে ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যে অত্যন্ত পারদর্শী। ছবি আঁকায় তাঁর আলাদা ধরনের কৃতিত্ব অনেকের কাছেই স্বীকৃত। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নিয়েও চর্চা করেছেন। আবার বাংলার বিভিন্ন জেলার কথ্য ভাষা এবং লোকসংস্কৃতি সম্পর্কেও এককালে গভীরভাবে চর্চা করেছেন।

কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন লেখক। এরকম লেখক খুবই বিরল যাঁকে মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক অসাধারণ প্রতিভাবান বলে মনে করেন—এবং বাদবাকি পাঠকরা তাঁর বই ছুঁয়ে দেখেন না। কিছুসংখ্যক পাঠক তাঁর নামই শোনেননি। কিছু সংখ্যক লোক তাঁর নাম শুনেছেন কিন্তু এক লাইনও লেখা পড়েননি। এবং একথাও নির্ভয়ে বলা যায়, কিছু লোক তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হলেও কোনো একটা লেখাও পড়ে শেষ করেননি।

কমলকুমার মজুমদারের রচনা সুলভ নয়। এককালে দেশ ও চতুরঙ্গ পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হলেও গত দশ বছর ধরে তাঁর অধিকাংশ রচনাই বেরিয়েছে কৃত্তিবাস কিংবা এক্ষণ-এর মতন লিটল ম্যাগাজিনে। এর আগে তাঁর দুটি মাত্র বই ছাপা হয়েছে—গল্পগ্রন্থ 'নিম অন্নপূর্ণা' এবং উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা।' এই বই দুটিও বিশেষ খোঁজাখুঁজি করে জোগাড় করা যায়।

সম্প্রতি বেরিয়েছে তাঁর সমগ্র গল্প-সংগ্রহ। তাঁর জীবনের প্রথম গল্পটি থেকে শুরু করে সাম্প্রতিকতম গল্পটি পর্যন্ত এতে স্থান পেয়েছে। 'গোলাপ সুন্দরী' নামের বড় গল্পটি শুধু এতে বাদ আছে—সেটি আলাদাভাবে বেরুতে পারে। এই গল্প-সংগ্রহের প্রচ্ছদপটও এঁকেছেন লেখক স্বয়ং। উৎসাহীদের কাছে এটি একটি অবশ্য সংগ্রহযোগ্য গ্রন্থ।

আমি কমলকুমার মজুমদারের অত্যন্ত ভক্ত, সেই বাল্যকাল থেকেই—এবং তাঁর রচনারীতির ঘোরতর বিরোধীও বটে। আমি তাঁর গল্পগুলি তো বটেই, উপন্যাস কয়েকটিও পড়েছি—একসময় তাঁর কয়েকটি রচনার প্রুফ দেখেছি বলে প্রতিটি লাইন বারবার পড়েছি। আমি মনে করি তাঁর রচনায় যে শিল্পগুণ, মানুষের চরিত্রের অন্তর্নিহিত ধর্মটি খুঁজে বার করার যে ক্ষমতা, ইদানীংকালের কোনো বাঙালী লেখকের মধ্যে তা নেই। লেখক হিসেবে তিনি চিরকালের আসরে স্থান পেতে পারেন। কিন্তু তিনি ক্রমশই তাঁর রচনায় যে ভাষারীতি তৈরী করছেন, আমার বিশ্বাস, তা অপ্রয়োজনীয় এবং ভাষাকে দুর্বোধ্যতম করার একটি খেয়াল। কমলকুমারের লেখা যে বেশী পাঠক পড়েন না—সেটা পাঠকদের দোষ নয়। পাথর গুঁড়ো করার পরিশ্রম করে কোনো বই পড়তে হবে—সাহিত্যের এই ধর্মের কথা কেউ নির্দেশ করেননি। বিশেষত কাহিনীমূলক রচনা পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগের প্রত্যাশী।

কমলকুমারের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ সালের ভাদ্র মাসে। চল্লিশ বছর আগে। সেই সময় বাংলায় অনেকেই সাধু ভাষায় লিখতেন—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর—এঁরা সকলেই প্রথম জীবনে সাধু বাংলাকে অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু কমলকুমারের প্রথম গল্প চলতি ভাষায় এবং ঝরঝরে গদ্যে। 'লাল জুতো' নামে এই গল্পটি— যে কোনো লেখকের প্রথম গল্প হিসেবে গর্ব করে বলার মতন। এর ভাষা এইরকম :

"একটি ছোট্ট বাক্স তার মধ্যে ঘুমন্ত দুটি জুতো, কি মধুর! নীতীশের চোখের সামনে সুন্দর দুটি মঙ্গল চরণ ভেসে উঠল। মনে হলো ও পা দুটি তার অনেক দিনের চেনা। অনেক স্বপ্নমাখা আনন্দ দিয়ে গড়া হাসি চাপতে পারলে না, হাসি যেন ছুটে আসছে, না হেসে থাকতে পারল না।"

এর পরের গল্পটির নাম 'জল', প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫৫ সালে। বন্যায় ভেসে গেছে চরাচর। ক্ষুধাক্লিষ্ট দুই সরল চাষী নিরুপায় হয়ে ডাকাতি করার জন্য যায়। একজনের নাম নন্দ অন্যজনের নাম ফজল। কিন্তু তারা ছদ্মনাম নেয় কানাই। দু-জনেই কানাই। তারা যে-ব্রাহ্মণের ওপর হামলা করে সে আবার যজমানের বাড়ি থেকে কুইনিন চুরি করে এনেছে। ভারী চমৎকার গল্প, মোটামুটি সুবোধ্য—তবে ভাষা বদলাতে শুরু করেছে। এই রকম : তার হাতে একখানা ধারালো দা আছে, আর সে হয় ফজল। অতঃপর ইত্যবসরে হঠাৎ সে অধৈর্য অস্থির যে সে কি করে এবং হস্তধৃত দা দিয়ে ছোট একটা কোপ দিয়েছিল, ঝোপের একটা ডালে, সঙ্গে সঙ্গে ডালটা মাটিতে পড়ে।

'মতিলাল পাদ্রী' এবং 'তাহাদের কথা'র মতন অসাধারণ গল্প দুটি ছাপা হয়েছিল দেশ পত্রিকায়। কমলকুমারের অন্যান্য রচনা যাঁরা পড়েছেন তাঁদের কাছে এই গল্প দুটির ভাষাও মোটামুটি সরলই মনে হবে, কিন্তু প্রথম পাঠক একটু থমকে যাবেন। বাক্যের গঠন

একটু অন্যরকম—সচরাচর বাংলা গদ্য যে-রকম পড়া যায় তেমন নয়—

কিন্তু এই গল্প দুটি সম্পর্কে অন্তত বলা যায় যে, ভাষার অন্যরকম ব্যবহার গল্প দুটিতে আলাদা সৌরভ এনেছে।

কিন্তু ১৩৭৫ সালে প্রকাশিত 'রুক্মিণীকুমার' কিংবা আরও পরে প্রকাশিত 'লুপ্ত পূজাবিধি' গল্পে তিনি ভাষাকে কোন এক বন্দীশালায় নিয়ে যেতে চাইছেন! বর্তমান দশকে তিনি এইরকম ভাষায় লিখছেন :

'ভদ্রমহিলা, কিন্তু স্বীয় মুখখানিকে, ঐ পারিপার্শ্বিকতাকে, সাবানের সূক্ষ্মতা ধরিয়া দক্ষতার সহিত পূর্বাবস্থাতে আনয়ন করিতে সময়, সপ্রতিভ দৃষ্টিতে তাকাইয়া, সপ্রতিভ হওয়ত নিজ বস্ত্র যাহা সুবিন্যস্ত আছে তাহাতেই ঠিক দিবার পরে, কণ্ঠ ঈষৎ সংস্কৃত করিয়া আরম্ভ করিলেন : ইহা অতীব দুঃখের যে প্রতি বৎসরে বঙ্গদেশে শিশুমৃত্যুর হার ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইতে আছে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে।'

এইরকম ভাষা মানে তো গল্প ও চিন্তাগুলিকে খুন করা। কমলকুমার নিজেই তাঁর গল্পগুলি নষ্ট করে আমাদের দুঃখ দিচ্ছেন। তিনি কি কবিতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান? এটা ভুল যুদ্ধ।

[এখানে মনে রাখতে হবে—কোনো অদ্ভুত শব্দ-ব্যবহারকেই ছাপার ভুল মনে করা চলবে না, কারণ বইটি অত্যন্ত যত্ন করে ছাপা। এবং আমরা শুনেছি, এই বইটি প্রস্তুত করতে প্রায় পাঁচ বছর সময় লেগেছে।]

তাঁর রচনার যেসব জায়গায় তাঁর প্রতিভা ঝলসে ওঠে সেরকম দু'একটি মাত্র অংশ উদ্ধৃত করি :

"সম্মুখে অগণন আলো, কেননা এখনও সকাল, চারকোণ আধভাঙা গোলাকার ছেঁড়া ছেঁড়া সতরঞ্চ-কাটা আলো, শিশির

কুয়াশার আলো, সম্ভপ্রসূত দুধেলা বাছুরের মত শাদা।”
(কোজ-ই-বন্দুক)।

“ব্লাউজের মধ্যে মাহিনার খুচরো টাকা কয়েকটি ঝিলিপ ঝিলিপ আওয়াজ করে ছেলেমানুষ অন্নপূর্ণাকে পুরুষোচিত মর্মবেদনা দিয়েছিল।” (তাহাদের কথা)

“আরাম কেদারায় ফুলের ছায়া-করা মখমলের উপর মোহন-গোপাল তাঁর মুখখানি ঘষলেন, সেখানে হিম ছিল। নিকটে কার্পেটে তাঁর মেয়েমানুষরা ছিটকে পড়ে ঘুমায়, বাইজীরা ঘুমে কাতর তথা মদে অচেতন।···কোনক্রমে বেসামাল পায় মোহনগোপাল ছাদের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গেলেন, কার্নিশের ওপর একটি পা তুলে দাঁড়িয়ে, তাকালেন, কার্পেটে এক ঝলক স্মৃতি, ওপাশে স্থিতিবান শাশ্বত মূর্তিনিচয় আর পিছনে পোড়া পৃথিবী! সম্মুখে দুপুরের লাল সেই দূরত্ব এখন আঁশখোয়া ধোঁয়াটে! তিনি এক পাশের ঠোঁট ফাঁক করে বললেন, ‘সব আমার—যা খুশী···” (কয়েদখানা)

কমলকুমার মজুমদার একালের সবচেয়ে প্রতিভাবান অজ্ঞাত-বাসকারী লেখক।

বইটা কিনেছিলাম এয়ার পোর্ট থেকে। মলাটে নিমীলিত-চক্ষু শেক্সপীয়ার এবং অর্ধনগ্না নারীর ছবি, এই সমন্বয়ই আমাকে আকৃষ্ট করে। সিটবেল্ট খোলা ও ধূমপানের অনুমতি পাবার পর আমি সিগারেট ধরিয়ে বইটা খুললাম। দু' পাতা পড়েই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বইটা আবার মুড়ে রাখতে হলো। বুঝতে পারলাম, এই লেখক খুব একজন চালাক মানুষ, গোটা বইটা জুড়ে খুব কায়দা ও বুদ্ধির খেলা দেখাবেন। আজকাল চালাক লেখকের রচনা পড়তে খুব ক্লান্তি লাগে আমার।

এক-একটা বই থাকে না, প্রথম কয়েক পাতা উল্টে আর পড়তে ইচ্ছে করে না। অথচ পড়তেই হয় শেষ পর্যন্ত। যেন এক কঠিন দায়িত্ব, কেউ যেন মাথার দিব্যি দিয়ে রেখেছে। এই বইটিও সে-রকম। নাম, 'নাথিং লাইক দা সান।' লেখক অ্যান্টনি বার্জেস। তাঁর এই বইয়ের নায়কের নাম ডব্লু এস। অর্থাৎ উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের জীবনী নিয়ে তিনি একটি উপন্যাস লিখেছেন। একজন কবির রহস্যাবৃত জীবন—অনেক তথ্যই জানা যায় না—তা নিয়ে কী-রকম উপন্যাস লেখা যায়, সেটা দেখার কৌতূহলই আমাকে শেষ পর্যন্ত বইটা পড়িয়ে ছেড়েছে।

প্রথম কয়েক লাইন পড়লেই বোঝা যায় এই লেখক অত্যন্ত চালাক—এবং শুধু চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কার্য হয় না, তা আর একবার প্রমাণিত হলো। মলাটে যদিও লেখককে যুদ্ধোত্তর কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক এবং ব্যঙ্গ-রচনাকার বলা হয়েছে। শোনা যায় ইনি একজন পণ্ডিত এবং বাজি রেখে উপন্যাস লেখেন।

শ্রীযুক্ত বার্জেস-এর প্রাচ্য-দেশীয় ছাত্ররা নাকি অভিযোগ জানিয়েছিল যে, প্রাচ্য-দেশীয়দের কাছে শেক্সপীয়ারের কিছুই দেবার নেই। শ্রীযুক্ত বার্জেস দেখিয়ে দিয়েছেন, প্রাচ্যের সঙ্গে ঐ কবির কতখানি যোগাযোগ। সে কথা ক্রমশ-প্রকাশ্য।

শ্রীযুক্ত বার্জেস শেক্সপীয়ারের কবিতাগুলি একেবারে গুলে খেয়েছেন। সামান্য একটা ইঙ্গিত বা শব্দ থেকেই তিনি গড়ে তুলেছেন একটা অধ্যায়—ঘটনা টেনে নিয়ে গেছেন নিজের ইচ্ছে মতন। নাটকগুলো থেকে শেক্সপীয়ারের জীবনীর উপাদান পাবার উপায় নেই বলে নাট্যকার শেক্সপীয়ার এখানে প্রায় অনুপস্থিত। কবি শেক্সপীয়ার, বিশেষত সনেটের শেক্সপীয়ারই প্রধান। নাটক সম্পর্কে এ-রকম ছোটখাটো তথ্য আছে যেমন, শেক্সপীয়ারের ছেলের নাম ছিল হ্যামলেট—তাকে গল্প বলে ভোলাবার জন্যই হ্যামলেট-এর প্লট তাঁর মাথায় আসে। যদিও আমরা জানি, হ্যামলেট কাহিনী আগেও প্রচলিত ছিল।

বইটি পড়তে পড়তে একটি ব্যাপারে অবাক হতেই হয়। একজন মহাকবি সম্পর্কে লিখতে গেলে খানিকটা শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব আশা করাই যায়। বার্জেস সাহেব ওসব রেয়াৎ করেননি। এ বইতে শেক্সপীয়ার নিছক একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের নায়ক—এবং তাঁকে দিয়ে লেখক এমন সব কাণ্ড করিয়েছেন যে আমাদের দেশের একজন শ্রদ্ধেয় মহাকবি সম্পর্কে কেউ ওসব উচ্চারণ করার কথাও ভাবতে পারেন না। আমাদের ভক্তিবাদী দেশে ভক্তির প্রাবল্য যথেষ্টরও বেশী হয়—কিন্তু বার্জেস সাহেব যদি একটুখানি ভক্তিনমিত হতেন, তা হলে উপন্যাসটি কিছুটা সার্থক হতে পারতো। যত যা-ই হোক, তিনি তো একজন সত্যিকারের 'মহাকবি সম্পর্কেই লিখেছেন, সাধারণ একজনকে নিয়ে তো না।

শেক্সপীয়ার কে ছিলেন এই তর্কের মধ্যে একদম ঢোকেননি বার্জেস। তিনি অবলম্বন করেছেন প্রচলিত শেক্সপীয়ারকে। যদিও

প্রচলিত হরিণ চুরির গল্পটার পাত্তা দেননি। শুরু হয়েছে শেক্সপীয়ারের সত্ত যৌবন বয়েস থেকে—আর পাঁচটা গরীব বাড়ির ছেলের মতন তিনি ঘরে বসে কবিতার লাইন মেলাচ্ছেন, ছোট ভাই বোনেরা চ্যাঁ ভ্যাঁ করছে, বাবা গজরাচ্ছেন, কী হয় ওসব কবিতা লিখে? তাঁর বাবা ছিলেন দস্তানা-ব্যবসায়ী। একজন পর্যটক অভিজাতের সঙ্গে পরিচয় হবার পর তিনি শেক্সপীয়ারের কবিতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁর বাড়িব ছেলেমেয়েদের গৃহ শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। এদিকে শুধু অর্থোপার্জনের জন্যই নয়—আর একটি কারণে শেক্সপীয়ারের গৃহত্যাগের প্রয়োজন ছিল। প্যাঁচে পড়ে তিনি তাঁর থেকে বয়েসে বড় অ্যান হ্যাথওয়েকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছেন। মাতাল অবস্থায় এক ভোরবেলা গাছতলায় অ্যান হ্যাথওয়ের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়। পরে শেক্সপীয়ার আর একটি মেয়েকে ভালোবাসেন, তাব নামও অ্যান, তার সঙ্গে বিয়ের সব ঠিকঠাক—এমন সময় অ্যান হ্যাথওয়ে রটিয়ে দিলেন যে তিনি গর্ভবতী। অ্যানের আত্মীয়রা মেরে-ধরে শেক্সপীয়ারকে বিয়ে করতে বাধ্য করলেন।

বিয়ে না হয় হলো। কিন্তু রাত্তিরবেলা বিছানায় শেক্সপীয়ার কাবু। অ্যান হ্যাথওয়ের কামনা-বাসনা ও শারীরিক লোভ অত্যন্ত তীব্র, তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারেন না শেক্সপীয়ার। তাই বাড়ি ছেড়ে পালাবার মতলব করলেন। এই বিচিত্র তথ্য কোথায় পেলেন লেখক? দুটিমাত্র লাইন থেকে:

Backward she pushed him,
as she would be thrust,
And govern'd him in strength
though not in lust.

যা-ই হোক প্রাইভেট টিউটর হিসেবে তিনি মোটামুটি সার্থক ছিলেন, সে বাড়ির গ্রন্থাগার তিনি নিজের কাজে লাগিয়েছেন।

কিন্তু গোল বাধলো, তিনি যখন একজন ছাত্রের সঙ্গে সমকামীর সম্পর্ক পাতিয়ে বসলেন। ছাত্ররা আবার যমজ (কী উদ্ভাবনী শক্তি বার্জেস-এর)—একজনের বদলে আর একজনকে ভুল করায় ধরা পড়ে গেলেন মাষ্টারমশাই—তার পর অর্ধচন্দ্র এবং বিতাড়ন। বাড়িতে ফিরে কিছুদিন কাটানোর পর আবার ভাগ্য ফেরাবার জন্ম এলেন লণ্ডনে। এখানেই তাঁর আসল জীবন শুরু। যোগ দিলেন রঙ্গালয়ে, নাটক ও কবিতা পাশাপাশি রচিত হতে লাগলো, কিন্তু খুব একটা হুলুস্থুলু পড়ে যাবার মতন ঘটনা নয়। যুদ্ধ ও প্লেগের প্রকোপে প্রায়ই থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। ক্রমশ পরিচয় হলো আর্ল অব এসেক্স-এর বন্ধু আর্ল অব সাদামপটনের সঙ্গে, যাঁকে উৎসর্গ করলেন 'ভিনাস অ্যাণ্ড অ্যাডোনিস'। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব—এবং শেষ পর্যন্ত এর সঙ্গেও সমকামী সম্পর্ক? এই সুদর্শন তরুণ অভিজাতটি বিবাহে বিমুখ—এবং যেহেতু সে শেক্সপীয়ারের সনেট পছন্দ করে, তাই তার মা শেক্সপীয়ারকে নিয়োজিত করলেন এমন সব কবিতা লেখার জন্য, যা পড়লেই বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়। বন্ধুর কাছে ধরাও পড়ে গেলেন শেক্সপীয়ার—এবং স্বীকার করলেন, কবিকেও তো খেয়ে-পরে বাঁচতে হবে—টাকা রোজগারের জন্য কত কি করতে হয়। ঐ বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েই তিনি একটা রঙ্গালয়ের আংশিক মালিকানা কিনে নেন।

যা-ই হোক সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক অংশটি এবার বলা যাক। শেক্সপীয়ারের কিছু কিছু সনেটের মধ্যে যে ডার্ক লেডির উল্লেখ পাওয়া যায়, তাকে নিয়ে এই লেখক এক জবরদস্ত প্রেম-কাহিনী ফেঁদেছেন। শেক্সপীয়ারের সেই ডার্ক লেডি আসলে একটি ভারতীয় মুসলমান মেয়ে। যার পূর্ব নাম ছিল ফতিমা। অভিজাত বংশের মেয়ে—ক্রীতদাসী হয়ে ইংলণ্ডে আসে, সৌন্দর্য ও স্বভাবগুণে অভিজাত সমাজের গণিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন তার নাম হয় লুসি। তার মাঝে মাঝে দেশের কথা মনে পড়ে, তার দেশে

কিস্‌-কে বলে চুমো—'সে আবার গণপতি বা গণেশঠাকুরের ভক্ত কেন হয়, তা অবশ্য বোঝা যায় না।)—একেই শেক্সপীয়ার দেবীর আসনে বসালেন, এর প্রেমে একেবারে হাবুডুবু, এর কৃপা পাওয়ার জন্য ব্যাকুল সেই কবি। বেশ কিছুদিন সেই মেয়েটি ও কবির মধ্যে উন্মাদ প্রণয়লীলা চলে। বহুকাল আগে শেক্সপীয়র স্বপ্নে, এই রকম একটি মেয়েকে দেখে কবিতা লিখেছিলেন :

My love being black,
her beauty may not shine
And light so foiled
to heat alone may turn.

পরে সেই নারীর সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল লণ্ডন শহরে। কিছুদিন পর ফতিমা বা লুসি বিশ্বাসঘাতকতা করে কবির প্রতি, পালিয়ে যায় কবির বন্ধু আর্ল অব সাদামপটনের সঙ্গে। আবার ফিরেও আসে—এবং কবি তাকে গ্রহণ করেন বিনা দ্বিধায়। তবে পুরোনো প্রেম আব জমলো না। এর মধ্যে আবার শেক্সপীয়ার সিফিলিস রোগ বাধিয়ে বসে আছেন।

স্ট্রাটফোর্ডের বিখ্যাত পুরুষ আবার ফিরে গেলেন স্ট্রাটফোর্ডে। কিন্তু ভগ্নমনোরথ, অসুস্থ শরীর। ইতিমধ্যে জেনে গেছেন, তাঁর স্ত্রী তাঁর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ব্যভিচারিণী। এলিজাবেথান যুগের নীতিহীনতার চূড়ান্ত। শেক্সপীয়ারের মৃত্যুদৃশ্যটা দারুণ কায়দা আর স্মার্টনেসের সঙ্গে লিখেছেন বার্জেস। শেক্সপীয়ার মরে গেলেন সেই কালো মেয়েটির স্বপ্ন দেখতে দেখতে।

সব মিলিয়ে উপন্যাসটিকে মনে হয় চতুর ইয়ার্কি। অতি ধুরন্ধর লেখকের কলমচর্চা। নিজের দেশের একজন মহাকবিকে নিয়েও এরকম ইয়ার্কি করতে পারে সাহেবরা!

একথা ঠিক, রবীন্দ্রচর্চা করে সারাজীবন কাটানো যায়। রবীন্দ্র-মানসিকতার সঙ্গে যাঁর সব মেলে, তাঁর পক্ষে বেশ আনন্দেরই ব্যাপার হবে। রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠ ও রবীন্দ্র-জীবনী অনুধাবন করলে মাঝে-মাঝেই আবিষ্কারের চমক পাওয়া যাবে।

তবে, অধিকাংশ মানুষের কাছেই রবীন্দ্রনাথ টুকরো টুকরোভাবে ছড়ানো। রবীন্দ্রনাথ একই অঙ্গে বহুরূপে, এর মধ্যে যাঁর যেটা পছন্দ। যেমন ধরা যাক, সাহিত্যিক বা সাহিত্য-পাঠক রবীন্দ্রনাথকে যে-ভাবে খুঁজবেন, সঙ্গীত-ভোক্তা বা রাজনীতিবিদ ঠিক সেইভাবে খুঁজবেন না।

সাহিত্যিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ এখনো পুরোনো হয়ে যাননি। মহত্তম লেখকও পুরোনো হয়ে যেতে পারেন—যদি তাঁর পরবর্তী কালে ভাষা দ্রুত বদলায়, অর্থাৎ আরও বেশ কিছু প্রতিভাশালী লেখক ভাষাকে বদলে দিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা ভাষা এখনও এমন বদলে যেতে পারেনি, যাতে রবীন্দ্রনাথের লেখা পুরোনো লাগবে। তাঁর কবিতায় একটু আরকেয়িক সুর লেগেছে, কারণ কবিতায় প্রকরণগত রূপান্তর ঘটে গেছে খানিকটা—কিন্তু পাঠযোগ্যতা এখনও নষ্ট হয়নি, বিরলে পাঠ করলে বিশুদ্ধ কাব্যরস এখনও হৃদয় স্পর্শ করে। আমি বলছি আধুনিক অবিশ্বাসী পাঠকের কথা। যাঁরা ভক্তি করে কাব্য পাঠ করেন, যাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ সত্যদ্রষ্টা কিংবা ঋষি, তাঁদের কথা আলাদা। যে-সব আধুনিক লেখক বা পাঠক রবীন্দ্রবিরোধী, তাঁদের ঐ রবীন্দ্র-বিরোধিতা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা প্রসূত, [illegible] শক্ত

বিরলে রবীন্দ্রকাব্য পাঠ করে অভিভূত। যিনি সত্যিই রবীন্দ্রনাথ পড়েন না বা পড়েননি বা পড়বেন না ঠিক করেছেন—তাঁর কোনো আশা নেই। তাঁর বারোটা বাজতে বেশী দেরি হবার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ যে ভালো করে পড়েনি, বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কথা বলার কোনো অধিকার তার এখনও জন্মায়নি। রকে বসে গরম গরম কথা বলার অধিকার অবশ্য কেউ আটকাতে পারছে না।

গদ্যে রবীন্দ্রনাথ আরও অনেক কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথের পর একজন উল্লেখযোগ্য গদ্য লেখকও এ পর্যন্ত রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত নন। আর একটা মজার ব্যাপার এই, অনেক নবীন লেখক গোড়ার দিকে ছটফটে গদ্য লেখার চেষ্টা করলেও প্রৌঢ়ত্বে এসে অনুভূতি প্রগাঢ় হলে ভাষা অধিকতর রাবীন্দ্রিক হয়ে যায়। উদাহরণ, অন্নদাশঙ্কর রায় এবং বুদ্ধদেব বসু। গদ্যের যে বাঁধন রবীন্দ্রনাথ তৈরী করে দিয়েছিলেন, তার প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো গদ্য-রীতি এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। একটু আধটু এদিক-ওদিক হতে পারে—কিন্তু মূল গদ্য-রীতি এক। যে যা-ই বলুক, এটাই সার সত্যি কথা। রবীন্দ্রনাথের নিন্দেগুলিও করা হয় রবীন্দ্রনাথের ভাষায়। এখন যে-কোনো আত্মজীবনী লেখা হয় জীবনস্মৃতির অনুকরণে। তুলনামূলকভাবে প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে অসার্থক—সেই কারণে রবীন্দ্র পরবর্তী-কালেও সত্যিকারের সৃষ্টিশীল প্রবন্ধের দৃষ্টান্ত বিরল।

রবীন্দ্রনাথের যে-সমস্ত কবিতা ও গান অত্যধিক জনপ্রিয়, সেগুলি আসলে তাঁর দুর্বলতর রচনা। ভালো, কিন্তু তেমন ভালো নয়। একজন লেখকের রচনার যেটুকু অংশ জনসাধারণ নিজের সম্পত্তি করে নেয়—সেটুকু আসলে অসার পদার্থ, এবং তার পেছনে সাহিত্যিক কারণ নেই। যেমন নজরুল জঙ্গী কবিতার লেখক হিসেবেই পরিচিত—অথচ নজরুলের প্রেমের কবিতাই বেশী।

অনেক তুখোড় আবার এইসব বহু-পরিচিত রচনাগুলিই উদ্ধার করে তাঁর সাহিত্য-কীর্তির বিচার করেন। একে বলা যায় অশিক্ষার

ফুরুল। আবার রবীন্দ্রনাথের রচনায় যাঁরা অনবরত দেশ এবং সমাজ রোগের ওষুধ খোঁজেন—তাঁরাও অন্য ধরনের মানুষ। শেক্সপীয়ারের রচনায় কেউ ওসব খোঁজে না, তবু তিনি মহৎ কবি হিসেবে স্বীকৃত, শেক্সপীয়ার ভাগ্যবান।

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির একটাও প্রকৃতপক্ষে নাটক নয়। সেইজন্যই বাংলায় মঞ্চসফল সাহিত্যগুণান্বিত নাটকের ট্র্যাডিশন তৈরি হলো না। হয় এখনও গিরিশ ঘোষের ঢংয়ের মেলোড্রামা, অথবা বিদেশী নাটকের ভাবানুবাদ অথবা মঞ্চসফল সাহিত্য-রসবর্জিত একপ্রকার অন্য জিনিস—হালফিল সিনেমার মতন। রবীন্দ্রনাথ অজ্ঞাতসারে বাংলা নাট্যশালারই কিছুটা ক্ষতি করে গেছেন।

একেবারে প্রথম থেকে, অচলিত রচনা-সংগ্রহ থেকে রবীন্দ্রনাথকে পড়তে শুরু করলে বারবার চমৎকৃত হতে হবে। এত কম বয়সে এত রুচি-সমুজ্জ্বল অথচ ক্ষুরধার রচনা পৃথিবীর খুব কম লেখকই লিখেছেন। তখনকার অধিকাংশ কবিতাই এখন ব্যাক ডেটেড কিন্তু তখনকার প্রায় সমস্ত গদ্য রচনাই এখনও ঝকঝকে।

আসল কথায় এবার আসি। রবীন্দ্রনাথের দুটি নতুন বই বের করা এখন খুবই দরকার। এবং এই বই দুটির ভার নেওয়া উচিত আধুনিক কোনো লেখকের। সঙ্গীত রচয়িতা এবং কবি রবীন্দ্রনাথের দুটি আলাদা পরিচয় দরকার—যা আধুনিক কালের রুচিতেও বিস্ময়কর। তাঁর গানগুলির মধ্যে অনেকগুলিই বেশ দুর্বল তবু অনবরত গীত হয়ে হয়ে আমাদের বিরক্তি জাগায়। আবার অনেক গান এখনও মুগ্ধ করে রাখে। এগুলি আলাদাভাবে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা নেই? আনুষ্ঠানিক, প্রেম, পূজা, প্রকৃতি ইত্যাদি বিভাগ এখন অচল। কয়েকটি গান ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে আছে—হঠাৎ চোখে পড়লে হতবাক হয়ে যেতে হয়। কিছুদিন আগে একজন মহিলা রবীন্দ্রনাথের 'একি সত্য সকলি সত্য' গানটির দুটি

লাইনের মানে জিজ্ঞেস করে আমাকে বিপর্যস্ত করে দিলেন। লাইন দুটি হচ্ছে, 'মোর নয়নের বিজুলি উজল আলো / যেন ঈশান কোণের ঝটিকার মত কালো।' এই ধরনের লাইনের মানে আমাদের বহুকাল ধরে খুঁজতে হবে।

সেই সঙ্গে চাই রবীন্দ্রনাথের একটি আধুনিক কবিতা-সংকলন। 'সঞ্চয়িতা' পড়তে গেলে হাঁপিয়ে যেতে হয়—যেন একটা মিউজিয়াম, প্রত্নতত্ত্ব থেকে আধুনিক শিল্পের পাঁচমিশেলি। রবীন্দ্রনাথের শিথিল বা আনুষ্ঠানিক কবিতাগুলি গবেষক বা অতি-উৎসাহীদের জন্য আলাদাভাবে রেখে তাঁর কালোত্তীর্ণ কবিতাবলীর একটি আলাদা সংকলন এক্ষুণি দরকার—আমাদের জন্য।

"আলটোনার বন্দী" নাটকটি প্যারিসে প্রথম অভিনীত হবার সময় তুমুল আন্দোলন উঠেছিল, সেই সময় ফরাসী সাপ্তাহিক পত্রিকা "দি এক্সপ্রেস"-এর পক্ষ থেকে তিনজন সাংবাদিক জাঁ পল সার্ত্র-কে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তরে সার্ত্র যে-সব কথা বলেছিলেন, তাতে নাটক সম্পর্কে তাঁর সমগ্র মতামত প্রতিফলিত হয়েছিল। ঘটনাটি আট বছর আগের, কিন্তু সেই ইণ্টারভিউটি সম্ভবত বাংলায় অনূদিত হয়নি, তাই অংশবিশেষ এখানে উদ্ধার করছি।

প্রশ্ন : আপনি "আলটোনার বন্দী" নাটকটা লিখলেন কেন? শুধু এই নাটকটার কথা বলছি না, মানে জানতে চাইছি, কিছু প্রকাশ করার জন্য আপনি থিয়েটারের মাধ্যম বেছে নিচ্ছেন কেন?

সার্ত্র : প্রথম কারণ, আমি আমার উপন্যাসটা শেষ করতে পারছি না। 'দি রোডস অব ফ্রিডম'-এর চতুর্থ খণ্ড প্রতিরোধ আন্দোলন নিয়ে লিখবো ভেবেছিলাম। তখন এই রকম বিষয় নির্বাচন সহজ ছিল— পরে অবশ্য সেটা আঁকড়ে থাকা বেশ সাহসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের বর্তমান কালের উৎকণ্ঠা ১৯৪৩ সালের গল্পের পটভূমিকায় ফোটানো আমার পক্ষে অসুবিধের।

প্রশ্ন : আপনার কি ধারণা উপন্যাসের চেয়ে নাটকের মাধ্যমে আপনি বেশী লোকের কাছে পৌঁছোতে পারবেন?

সার্ত্র : নাটক যদি সার্থক হয় তবে সেই লেখক বিশাল জনসমষ্টির কাছে সহজেই পৌঁছোতে পারেন, অন্তত কিছুদিনের জন্য। তারপর, কী জানি···। একটা সার্থক নাটক যদি ১০০

-রাত্তির চলে—তাহলে প্রায় ১ লক্ষ দর্শক···কোনো উপন্যাস ১ লক্ষ কপি বিক্রি হওয়া যথেষ্ট অভাবনীয়···

প্রশ্ন : আপনার অনেক বই তো পকেট বই সংস্করণে ১ লক্ষেরও বেশী কপি বিক্রি হয়েছে, তা ছাড়া একটা বই অনেকে পড়ে—

সার্ত্র : তা ঠিক। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা অন্যরকম। একটা বই-এর সার্থকতা কত কপি বিক্রি হলো তার ওপর নির্ভর করে না। আমি এমন বেশ কয়েকটা বিস্ময়কর বই-এর কথা জানি—তিন চার হাজারের বেশী বিক্রি হয়নি —অথচ সেইসব বই একটা জেনারেশানকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। কাফকা'র বই ফ্রান্সে বেশী বিক্রি হয়নি, অথচ কাফকাকে বাদ দিলে আমার বয়সী অনেক বুদ্ধিজীবীরই রূপ অন্যরকম হতো। থিয়েটার যে-হেতু বেশ খরচের ব্যাপার—সেইজন্য তার তৎক্ষণাৎ সার্থকতা চাই। ব্যর্থ হলেই তার দায় নাট্যকারের। উপন্যাসে ঠাণ্ডা স্বরে কথা বলা যায়, কিন্তু নাটকে উচ্চকণ্ঠ হতে হবেই। এই ব্যাপারটাই বোধ হয় থিয়েটার সম্পর্কে আমাকে আকর্ষণ করে।

প্রশ্ন : দর্শকরা নাটক থেকে কী আশা করে আপনার ধারণা ?

সার্ত্র : আমিও তো সেটা জানতে চাই। থিয়েটার একেবারে জনসাধারণের সম্পত্তি। দর্শকরা উপস্থিত হওয়া মাত্রই নাটকটা নাট্যকারের হাতছাড়া হয়ে যায়। অন্তত আমার সব নাটকগুলোই এখন আমার অধীন নয়। ওরা এক-একটা object হয়ে গেছে। পরে অবশ্য বলা যায়, "আমি তো ও-কথা বলতে চাইনি"—প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কাইজার যে-রকম বলেছিলেন—কিন্তু যা একবার হয়ে গেছে, তা হয়েই গেছে।

প্রশ্ন : সেটা সিনেমার ক্ষেত্রে খুবই সত্যি। জনসাধারণ সেটা "গ্রহণ" করার পর হয় মানেটা বদলে ফেলে কিংবা নতুন অর্থ চাপায়, কিন্তু নাটকের ব্যাপারে কি নাট্যকার রিহার্সালের সময় তাঁর মতামত জানাতে পারেন না ?

সার্ত্র: না। নাটকটা যেভাবে উপস্থিত হয়েছে সেটাই বড়, অভিনেতা বা পরিচালককে দোষ দিয়ে লাভ নেই। অভিনেতাদের হাঁটা চলা, আলো, সময়ক্ষেপ, মুখভঙ্গী—সব মিলিয়ে নাটক একটা আলাদা সৃষ্টি হয়ে ওঠে—যেটা নাট্যকারের সীমানার বাইরে। ...আধুনিক চিত্রশিল্পীরা যেমন বলেন, শিল্প প্রথমেই একটা object, মঞ্চের ওপর নাটকও তা-ই।

প্রশ্ন: আপনি সব সময় এই বদল পছন্দ করেন?

সার্ত্র: না। কিন্তু উপায় কী? 'পাবলিক' হচ্ছে একটা সমষ্টি—প্রত্যেক দর্শকই নাটক দেখার সময় শুধু নিজের অনুভূতির কথাই চিন্তা করে না, অন্যরা কী ভাবছে—সেটা নিয়েও মাথা ঘামায়।...

...আমার "নোংরা হাত" নাটকটা যখন প্রথম অভিনীত হলো—অনেকে সেটা ভালো বলেছিলেন। কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিল, ওটা কি সাম্যবাদ বিরোধী, কিংবা না? চরম বামপন্থী কাগজগুলো কোনো মতামত জানালো না। তারপর যখন তারা মন স্থির করলো যে ওটা সম্পূর্ণ ই ওদের পার্টিকে আক্রমণ করে লেখা (আমি মোটেই সে-রকম কথা ভাবিনি)—তখন আবার দক্ষিণপন্থী কাগজগুলোতে ওর প্রশংসার ধুম পড়ে গেল। ফলে বামপন্থীরা আরও নিশ্চিন্ত হলো। সেই থেকে নাটকটা এমন একটা objective অর্থ গ্রহণ করেছে—আমি হাজার চেষ্টা করেও তা বদলাতে পারিনি।

প্রশ্ন: কিন্তু আপনি তো আলাদাভাবে আপনার মতামত জানাতে পারতেন।

সার্ত্র: সেটা হতো অরণ্যে রোদন। থিয়েটারে—আমি কী বোঝাতে চেয়েছিলাম তার কোনোই মূল্য নেই। একমাত্র দাম, কী বোঝা যাচ্ছে। নাট্যকারের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরাও ওই নাটকটির লেখক।...

আমাদের কালে দর্শকদের মধ্যে অনেক শ্রেণী, তাদের মত ও রুচি-

পরস্পর বিরোধী। মোটের ওপর থিয়েটার এখনও বুর্জোয়া সমাজের দ্বারা পুষ্ট। তারাই বর্ধিত দামের টিকিট কিনে থিয়েটারকে বাঁচায়। আবার মধ্যবিত্ত শ্রেণী এমনকি শাসক শ্রেণীর মধ্যেও এমন পরস্পর বিরোধিতা আছে যে—যে-কোনো একদিকের চিত্র ফুটিয়ে যদি একদলকে খুশী করা যায়—তবে অন্যদল হয়তো চটে যাবে। ফলে থিয়েটারে সাধারণত মানুষ ও পৃথিবীর পরিবর্তনের ছবি ফোটানো হয় না—বরং এমন একটা ছবি দেয়—যা এই অপরিবর্তিত বিশ্বে অপরিবর্তিত মানুষের।

বই চুরি

বন্ধুবান্ধবের বাড়ি থেকে কোনো বই পড়তে আনার নাম করে ফেরৎ না দেওয়া খানিকটা দোষের কাজ বটে, কিন্তু কেউ এটাকে চুরি বলে গণ্য করে না। তা ছাড়া এই প্রথাটি বহুকাল ধরে চলে আসছে।

কিন্তু গ্রন্থস্বত্ব চুরির ব্যাপারটা ধিক্কারজনক। এতে বঞ্চনা করা হচ্ছে বইয়ের মালিককে শুধু নয়, বইয়ের লেখককেও—যাঁর পরিশ্রমের ফসল ঐ বইখানি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগে পশ্চিম বাংলার জনপ্রিয় লেখকদের বই সেখানকার অসাধু প্রকাশকরা বেআইনীভাবে ছাপিয়ে বাজারে বিক্রী করতেন। এ খবর আমরা অনেকবার শুনেছি। এখন ঐ ব্যাপার বন্ধ করা হচ্ছে। কিন্তু ভারতেও পুস্তকদস্যুতা যে অবাধে চলে, সে-সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হয়নি। সম্প্রতি 'হিন্দুস্তান টাইমস' পত্রিকা খোদ রাজধানী দিল্লীতেই এ-ধরনের চোরা কারবার সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন।

দিল্লির একটি দুষ্টচক্র এই ব্যাপার বহুদিন ধরে চালাচ্ছে। যে-কোনো জনপ্রিয় ব্রিটিশ বা মারকিন দেশের বই এরা অতি দ্রুত ছাপিয়ে বাজারে ছেড়ে দেয়। পাঠকদের কাছে চাহিদা আছে, এমন যে-কোনো বই, সে-ব্যাপারে ওদের কোনো চক্ষুলজ্জাও নেই। 'সেনজুয়াস উওম্যান', নামে একটি নবেল এখন দিল্লী-বোম্বাইতে বেশ বাজার কেড়েছে, বোম্বাইয়ের এক প্রকাশক সেখানি ভারতে প্রকাশের আলাদা স্বত্ব সংগ্রহ করে। কিন্তু সেই প্রকাশকের বই দপ্তরিখানা থেকে বেরুবার আগেই জাল বইতে দোকান ছেয়ে গেল। ঐ জাল বই অন্তত পাঁচ হাজার বিক্রী হয়েছে শুধু দিল্লীতে। দিল্লির

একজন সাংবাদিক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে একটি বই লিখছিলেন ইংরেজিতে—কিন্তু তিনি লেখা শেষ করার আগেই হতবাক হয়ে দেখলেন, তাঁরই নামে ঐ বই বাজারে বেরিয়ে গেছে। অনুসন্ধানে জানা গেল, তিনি কয়েকটি অধ্যায় লিখে তাঁর প্রকাশককে দেখতে দিয়ে ছিলেন—প্রকাশকের কাছ থেকে সেটা 'কোনোরকমে' বাইরে চলে যায়—তারপর সেইটুকুই ছাপা হয়ে মলাটে মুড়ে বইয়ের দোকানে।

দু' ধরনের জালিয়াতি হয়। পুরো বইটাই হুবহু বেআইনীভাবে ছাপানো। অথবা জনপ্রিয় বইয়ের অংশবিশেষ একটু-আধটু বদলে, খানিকটা অন্য চেহারায় আইন ফাঁকি দেবার চেষ্টা। খুব বেশী চেষ্টারও দরকার নেই। কারণ, কপিরাইট আইন অত্যন্ত গোলমেলে। এবং লেখকরা সাধারণত মামলাপ্রবণ নন, সহজে আদালতে যেতে চান না। আইনের থেকে আইনের ব্যাখ্যা আরও জটিল—সুতরাং এই ধরনের মামলা, দীর্ঘসূত্রী অলস স্বভাবের আদালত বহুদিন ধরে টানবে, তাতে প্রকৃত সুবিচার প্রার্থীরও বহু সময় ও টাকা নষ্ট অবধারিত।

শুধু ইংরেজি বই নয়, প্রাদেশিক ভাষার বই নিয়ে জোচ্চুরিও রাজধানীতে চলছে। বাংলা বা তামিল বা অন্য ভাষার জনপ্রিয় লেখকদের রচনা, অনুমতি না নিয়েই হিন্দী অনুবাদ করে ছাপানোর ঘটনা বিরল নয়। পাকিস্তানের জনপ্রিয় উর্দু বই গোপনে পাচার করে এনে অন্য নামে ভারতে ছাপা হচ্ছে। তেমনি কিছু কিছু হিন্দী বইও উর্দু অনুবাদে ছাপা হচ্ছে পাকিস্তানে। সবটাই সীমান্তের চোরাকারবারীদের মাধ্যমে চলছে।

পশ্চিম বাংলার চিত্রটা কী? পশ্চিম বাংলায় অনুবাদ-বই জনপ্রিয় হয় না। ইংরেজি বই বেআইনীভাবে ছাপানোর কোনো দৃষ্টান্ত চোখে পড়েনি। এখানে চলছে আরও সহজ ব্যাপার। এখানকারই লেখকদের বই বেআইনীভাবে ছাপানো সবচেয়ে সুবিধাজনক। দপ্তরিখানা থেকে ফর্মা চুরি করে কিংবা প্রেস থেকে বেশী সংখ্যায় ছাপিয়ে নেবার খবরও শোনা যায়।

একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'বালিকা বধূ'। বিমল কর রচিত এই উপন্যাসটি বছর কয়েক আগে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল—অবিলম্বে তার ভেজাল সংস্করণ বেরিয়ে গেল, কিন্তু সেখানে লেখকের নাম বিমল মিত্র। দু'জন লেখকের নাম এক সঙ্গে ভাঙাবার বিচিত্র কৌশল। এইরকম বেশ কিছু বই নিয়েই ঢালাও ব্যবসা চলছে।

সরলমতি পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, আসল বই থাকতে জাল বই লোকে কিনবে কেন? উত্তরটি খুব সোজা। জাল বইতে লেখককে কোনো রয়ালটি দিতে হয় না, সেই টাকার কিছু অংশ বর্ধিত কমিশন হিসেবে পুস্তক বিক্রেতাদের দেওয়া হয়। বর্ধিত হারে কমিশনের এইসব বই—বড় বড় দোকানে জায়গা না পেলেও মফস্বলের বিক্রেতাদের কাছে লোভনীয়!

ভারতীয় কপিরাইট আইনের অতি সরল নির্গলিতার্থ এই যে, এই দেশের সীমানার মধ্যে যে-কোনো স্থানে কোনো লেখকের বা তাঁর উত্তরাধিকারীর বিনা অনুমতিতে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশ নিষিদ্ধ। লেখকের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর তাঁর রচনা যে-কেউ প্রকাশ করতে পারে। মোটামুটি অন্তর্জাতিক আইনও এই।

এই আইন যারা অমান্য করছে, তাদের কীভাবে দমন করা যেতে পারে? লেখকের নামসমেত হুবহু নকল করা বই বাজারে বেরুলে পুলিশ সেখানে হস্তক্ষেপ কবতে পারে—এবং শাস্তি অবধারিত। কিন্তু সামান্য কিছু অদল বদল করে নিলেই আইন সেখানে বহু শাখা বিস্তার করে। তখন লেখক বা পুলিশের কিছু করার থাকে না। সেক্ষেত্রে পাঠক বা পুস্তক বিক্রেতারা সজাগ হলে এই ব্যবসায়ীদের নিরুৎসাহ করা যায়।

আরও একটি সহজ উপায় আছে—লেখকরা যদি তাঁদের সমস্ত রচনা থেকেই অধিকার ছেড়ে দেন। তিনি লিখেই খুশী থাকবেন, টাকা পয়সা চাইবেন না—যার ইচ্ছে ছাপুক, যার ইচ্ছে পড়ুক। জ্ঞান বা শিল্প, মূল্যের অতীত এবং সর্বসাধারণের সম্পত্তি হয়ে যাক।

ফ্রানৎস কাফকার বয়েস যখন আটত্রিশ, লেখক হিসেবে খ্যাতি খুব সামান্যই, ফুসফুসের অসুখে অফিসে সাধারণ চাকরি করেন, অবিবাহিত—সেই সময় মিলেনা নামের এক যুবতীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। মিলেনার বয়েস তখন চব্বিশ, স্বাস্থ্যবতী, দুঃসাহসিনী এবং বিবাহিতা। মিলেনা সেই সময়েই কাফকার সাহিত্য-প্রতিভা সঠিক অনুধাবন করতে পেরেছিল। এই দু'জনের প্রণয় ছিল যেমন তীব্র, তেমনই অভিশপ্ত, বিচ্ছেদই ছিল এদের নিয়তি।

মিলেনা একটি খাঁটি বোহেমিয়ান মেয়ে। আক্ষরিক অর্থে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে চেকোশ্লোভাকিয়ার যে-অংশের নাম ছিল বোহেমিয়া, তার অন্তর্গত প্রাগ শহরের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে মিলেনার জন্ম। অল্প বয়েসে তার মা মারা যায়। বাবার একমাত্র মেয়ে—বাবা ছিলেন গোঁড়া জাতীয়তাবাদী এবং মিলেনা প্রায় কৈশোর থেকেই বাবার অনুশাসন এবং সামাজিক রীতিকে অগ্রাহ্য করতে শিখেছে। সেই রক্ষণশীল আমলেই তরুণী মিলেনা রাস্তা দিয়ে অদ্ভুত পোশাক পরে হেঁটে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং অনেকের ভুরু উত্তোলিত করেছে। ক্রমে, অবধারিত ভাবেই মিলেনা এসে পড়ে লেখক-শিল্পী-কবিদের আড্ডায়।

চেকোশ্লোভাকিয়ার অবস্থাটা তখন বেশ গোলমেলে। অস্ট্রিয়ান তথা জার্মান আধিপত্যের জন্য এখানকার জাতীয়তাবাদীদের ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। চেকোশ্লোভাক-ভাষী এবং জার্মানভাষীদের মধ্যে

তার রেষারেষি—প্রায়ই দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। এবং হিটলার তখনো আসরে অবতীর্ণ না হলেও ইহুদী-বিদ্বেষ চতুর্দিকে লক্লক্ করছে। ইহুদীরা তখন 'ইওরোপের নিগ্রো'।

লেখক-কবিদের মধ্যে মিলেনার প্রণয় হলো এমন একজনের সঙ্গে, যে নিজে ঠিক লেখক না হলেও সাহিত্যের সমঝদার, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিজীবী, দর্শনশাস্ত্রের গবেষক এবং রূপবান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, সে জার্মান এবং ইহুদী। চেক পরিবারের কোনো মেয়ের পক্ষে সেই সময় কোনো জার্মান-ইহুদীর সঙ্গে মেলামেশা করা মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। মিলেনা এসব কিছুই গ্রাহ্য করলো না—এমনকি, তার প্রেমিক অর্নস্ট পোলাক-এর সঙ্গে সে কবে কোন্ হোটেলে রাত কাটিয়েছে তাও বলে বেড়াতে লাগলো প্রকাশ্যে—যেন এটা একটা বিরাট অ্যাডভেঞ্চার। খবর পেয়ে মিলেনার বাবা যে অত্যন্ত জ্বলে উঠবেন, তা বলা-ই বাহুল্য। ধমক ও ভয় দেখানোর পর তিনি মেয়েকে জোর করে তালাচাবি বন্ধ করে রাখলেন একটা বাগানবাড়িতে।

কয়েকদিন বাদেই মিলেনা সেখান থেকে পালিয়ে এসে বিয়ে করলো পোলাককে এবং চলে গেল ভিয়েনায়।

প্রথম কিছুদিন খুব হৈচৈ, আনন্দ উন্মাদনায় কাটলো। কাফে রেস্তোরাঁয় সাহিত্যিকদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা, কখনো কখনো বাড়িতে সারারাত আড্ডা। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়ালো। প্রেমিক আর স্বামী এক নয়। পোলাককে কোনোক্রমেই আদর্শ স্বামী বলা যায় না, কিন্তু প্রেমিক হিসেবে সে এখনো আদর্শ, কারণ, সে মুক্ত ভালোবাসায় বিশ্বাসী বলে প্রায়ই অপর নারীদের সঙ্গে সহবাসে তার দ্বিধা নেই। নারীরা তাকে দেখে মুগ্ধ হয়। তাছাড়া পোলাক খুব বড় বুদ্ধিজীবী এবং দার্শনিক হলেও সংসার সম্পর্কে উদাসীন—খাওয়া-দাওয়া কী করে জুটবে, সে বিষয়ে চিন্তা করে না। অপমানিত এবং বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লো মিলেনা।

তার বাবাও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। উপায়ান্তর না দেখে মিলেনা সংসার চালাবার জন্য চেক ভাষা শিক্ষার একটা স্কুল খুললো, এবং টুকিটাকি লিখতে লাগলো সংবাদপত্রে। অনুবাদের চিন্তাও তার মাথায় আসে। ফ্রানৎস কাফকা নামের একজন স্বল্পপরিচিত লেখকের গল্প অনুবাদ করে পাঠায় এক প্রকাশকের কাছে। কয়েকদিন বাদেই চিঠির উত্তর আসে, প্রকাশকের কাছ থেকে নয়, স্বয়ং লেখকের কাছ থেকে। এর পরের কয়েকটি চিঠি বিনিময়েই দুই দুঃখী আত্মা পরস্পরের খুব কাছে চলে আসে।

কাফকার সঙ্গে মিলেনার পূর্ব পরিচয় না থাকলেও একেবারে অজানা ছিলেন না। কফির দোকানের সাহিত্যিক আড্ডায় কাফকার সঙ্গে একসময় আলাপ হয়েছে অর্নস্ট পোলাকের—সেই সময় টেবিলের ফাঁকে ফাঁকে মিলেনার হেঁটে যাওয়া চেহারা অস্পষ্ট মনে আছে। সেই সময়, ১৯২০ সালে, কাফকা স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ছুটি নিয়ে এসে রয়েছিলেন মেরানো নামে একটা ছোট শহরে। অনুবাদ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য মিলেনা এলেন ওখানে, তারপরই পাশার দান পড়ে গেল।

নারী সম্পর্কে কাফকা ছিলেন স্বভাবভীরু। সেই আটত্রিশ বছর বয়সেও কাফকা তিনবার বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে (এর মধ্যে দু'বার একই নারীকে) ভেঙে দিয়েছেন। মিলেনার মধ্যে তিনি খুঁজে পেলেন তাঁর জীবনের পরমা নারীকে। দু'জনে থাকে দুই শহরে, যোগাযোগের একমাত্র উপায় চিঠি। অসম্ভব, অজস্র চিঠি। প্রতিদিন চিঠি, একদিনে দু'তিনখানা চিঠি, তার ওপরে আবার টেলিগ্রাম। মিলেনার লেখা চিঠিগুলোর একটাও পাওয়া যায় না, মিলেনারই অনুরোধে সেগুলি কাফকা পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। আর কাফকার লেখা চিঠিগুলি মিলেনা তার এক বন্ধুর কাছে রাখতে দিয়েছিল—হিটলারী তাণ্ডবের পরও সেগুলো কোনোক্রমে রক্ষা পায়—এবং সাহিত্যের সম্পদ হয়ে আছে। কাফকার অকৃত্রিম বন্ধু কবি ম্যাক্স

ব্রড, কাফকার সমস্ত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা সম্পাদনা করে নতুন ভাবে প্রচার করে বিশ্ব সাহিত্যকে কৃতজ্ঞ করে রেখেছেন—তেমনি এই চিঠিগুলিও কাফকাকে চিনতে অনেকখানি সাহায্য করে।

কাফকা মিলেনার স্বামীর ভয়ে চিঠিগুলো পাঠাতেন পোস্ট অফিসের ঠিকানায়—মিলেনার কাজ ছিল, প্রায় দু'বছর ধরে, প্রতিদিন পোস্ট অফিসে গিয়ে চিঠির প্রতীক্ষা করা। আর কাফকা তখন এমনিতেই অনিদ্রা-রোগী, চিঠির প্রত্যাশায় তাঁর আহার-নিদ্রা ঘুচে গেছে। দু'জনের মধ্যে মিলেনাই বয়েসে অনেক ছোট হলেও কাফকার ব্যবহারই বেশী ছেলেমানুষীতে ভরা।

প্রথম দিকের চিঠিগুলোতে ভালোবাসার আবেগ অত্যন্ত তীব্র, কিন্তু সেই ভালোবাসা প্লেটনিক। দূরের এক শহরে বসেও কাফকা অনুভব করছেন মিলেনার নিশ্বাস, হাসি, কথা। মিলেনা কাছে নেই, তবু তার উপস্থিতি সর্বত্র।

মিলেনা এক জায়গায় বলেছে, 'ভালো না বাসলে একজন মানুষকে পুরোপুরি চেনা যায় না'। কিন্তু এই ভালোবাসার মধ্যে শরীর আছে। শরীরও শরীরকে জানতে চায়। কাফকা একবার গোপনে ভিয়েনায় এসে দেখা করলেন মিলেনার সঙ্গে। চারদিন কাটিয়ে গেলেন। কিন্তু এই মিলনে পরিপূর্ণতা ছিল না।

এর পরের চিঠিগুলোতে প্রায়ই 'ভয়ের কথা', আর মিলেনা যেন কাফকাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। শারীরিক সম্পর্কের সময় কাফকা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন?

কিছুদিন পর আবার প্রকাশিত হয় পরস্পরকে দেখার বাসনা। চিঠির পর চিঠিতে চলছে গোপন পরিকল্পনা, কোথায় দেখা হবে। কখনো সব ঠিকঠাক হয়ে যাবার পরও মিলেনা আসতে পারছে না। আর, মিলেনার সনির্বন্ধ অনুরোধেও কাফকা যে ভিয়েনাতে কেন যেতে পারছেন না, তার কারণটা খুব মজার। কাফকা অফিস থেকে ছুটি

নেবেন কী করে, বসের কাছে যে তাহলে মিথ্যে কথা বলতে হবে। তা কি সম্ভব? না, কাফকার পক্ষে সম্ভব নয়।

যা-ই হোক, কিছুদিন বাদে দু'জনের দুই শহরের মাঝামাঝি, চেক-অস্ট্রিয়া সীমান্তে গমুণ্ড নামে একটি ছোট শহরে আবার দু'জনে দেখা করলো। এ মিলনও সার্থক হয়নি, এক্ষেত্রে কাফকার 'ভয়' আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কারণ, পরবর্তী চিঠিতে কাফকা লিখছেন, গমুণ্ডের সময়গুলোর কথা আমি এখন চিন্তা করতেও চাইছি না।

এই ভয়জনিত বিস্বাদ জীবন কাফকার রচনার যেমন অঙ্গ, তেমনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও। কাফকা লিখতেন জার্মান ভাষায় এবং ইহুদী, চেকোশ্লোভাকিয়ায় জার্মান ইহুদীদের বিরুদ্ধে মিছিল তার ঘরের জানলার নিচ দিয়ে চলে যায়। এই বোধ মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। ম্যাক্স ব্রড লিখিত তাঁর জীবনী পড়ে আমরা জানি, বাবার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল কী রকম অস্বাভাবিক। একটা অফিসে চাকরি করতেন, যে-চাকরি তাঁর কোনোদিন পছন্দ হয়নি। বহু বছর তাঁর স্বাভাবিক ঘুম হয়নি। মানুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল, একাচোরা, বিলাসিতাহীন অনেকটা সন্ন্যাসীর মতন, কিন্তু ভীতু সন্ন্যাসী। কোনোরকম নেশা কিংবা মিথ্যে কথা—এতেও তিনি আশ্রয় নিতে পারেননি।

ডায়রিতে কাফকা এক জায়গায় লিখেছেন, তোমার শরীরের যৌন শক্তি দিয়ে তুমি কী পেলে? শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতা, সবাই বলবে। অথচ খুব সহজেই সার্থক হতে পারতো……এম (মিলেনা) ঠিকই বলেছিল…ভয় মানেই সুখহীনতা…।

কাফকা মিলেনাকে দারুণভাবে নিজের করে চেয়েছিলেন, ভেবেছিলেন এই মেয়েটিকে পেলেই তিনি উদ্ধার পেয়ে যাবেন—কিন্তু মিলেনার কাছাকাছি যাওয়ার ব্যাপারে ভয়। উভয়েরই পরিচিত তৃতীয়-কোনো ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলে কাফকা তার কাছ

থেকে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মতন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মিলেনার কথা শুনতে চেয়েছেন। কিন্তু মিলেনার সঙ্গে তাঁর যে কবার দেখা হয়েছে, তার কোনোটাই কিন্তু বেশী সুখের হয়নি।

শেষের দিকে মিলেনা বরং দু'-একবার সামান্য ভর্ৎসনা করেছে কাফকাকে, কিন্তু কাফকা চিঠিতে কখনো সামান্য আঘাত দিয়েও কথা বলেননি। বরং এই সময়কার চিঠিতে তিনি সূক্ষ্ম কাব্যরসের সঙ্গে তীব্র আর্তি যেমনভাবে মিলিয়েছেন, তার তুলনা খুব কম আছে। এই এক আশ্চর্য ব্যাপার, ব্যক্তিগত জীবনে যারা সার্থক হতে পারে না, তারা এমন বিস্ময়কর সাহিত্য সৃষ্টি করে যায় কী করে?

মিলেনা ও কাফকার এই পত্র-প্রণয় চলেছিল প্রায় আড়াই-তিন বছর। শেষপর্যন্ত কাফকা নিজেই নিষেধ করেছিলেন মিলেনাকে চিঠি লিখতে। তাঁর অসুখ যত বাড়ছিল, ততই মিলেনার চিঠি ও চিন্তা তাঁর পক্ষে বড় বেশী যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠছিল। স্যানোটোরিয়ামেও তিনি মিলেনাকে আনতে দিতে চাননি। এই সময় তাঁর এক বন্ধু বলেছিলেন, মিলেনাকে পেলে কাফকা এখনো বোধহয় বেঁচে উঠতে পারেন। একদিকে মিলেনা আর অপরদিকে মৃত্যু, কাফকাকে বেছে নিতে হবে। কাফকা বলেছিলেন, বেছে নেবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, আগে থেকেই ঠিক করা আছে। মৃত্যুর ঠিক আগে কাফকার সঙ্গে মিলেনার আর একবার দেখা হয়েছিল কি না, সে-সম্পর্কে সংশয় রয়ে গেছে। মিলেনা তার সঙ্গে কাফকার প্রণয়ের কথা প্রকাশ্যে কখনো জানাতে পারেনি, কিন্তু তার যে-সমস্ত লেখায় কাফকার উল্লেখ আছে, তাতে বোঝা যায়, সে কাফকাকে ঠিক মতন চিনতে পেরেছিল এবং তার ভালোবাসা ছিল আন্তরিক।

এর পর মিলেনা স্বামী ত্যাগ করে। পরবর্তী জীবনে সে আরও একবার বিবাহ এবং বারকতক প্রণয় করলেও কখনো ঠিক সুখ

পায়নি। প্রাগে ফিরে আসার পর সাংবাদিক হিসেবে তার প্রচুর নাম হয়—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে সে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেয় এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার পতনের পর নাৎসী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে চালান হয়ে যায় কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে। সেখানেই মারা যায়।

কাফকা-মিলেনা পর্ব সম্পর্কে জানা যায় ম্যাক্স ব্রড-এর লেখা কাফকার জীবনী এবং সম্পাদিত ডায়েরি ছাড়াও, উইলি হাস সম্পাদিত 'লেটারস টু মিলেনা' এবং মার্গারেট বুবের নিউমান লিখিত জীবনী, 'মিসট্রেস টু কাফকা' থেকে।

ছেলেটির বয়েস বাইশ তেইশ, মাথা ভর্তি চুল, লেখে এবং অবধারিত ভাবে, পত্রিকা প্রকাশ করে। বলা-ই বাহুল্য, সে তার পত্রিকাটিকে প্রেমিকার চেয়েও বেশী ভালোবাসে (প্রেমিকা সম্ভবত নেই, যদি থাকতো তা হলেও) এবং সে মনে করে তার পত্রিকাটিই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু পত্রিকা বার করার অনেক ঝামেলা। প্রেস ছোট পত্রিকাগুলিকে সহজে পাত্তা দিতে চায় না। বিশেষত সীজন্-এর সময় এই সব পত্রিকার খুব দুরবস্থা।

এর ওপর আছে বিজ্ঞাপন সংগ্রহের সমস্যা। লিটল ম্যাগাজিন সাধারণত 'এস্টাব্লিশমেণ্ট' বিরোধী হয়, কিন্তু বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য যেতে হয় বিভিন্ন এস্টাব্লিশমেণ্টের দরজায়। কারণ, শুধু পত্রিকা বিক্রি করে খরচ তোলা একটা অসম্ভব কথা। বিক্রী যা-ও হয় স্টল থেকে বিক্রির টাকা আদায় করতে জুতো ছিঁড়ে যায়। পুরো খরচ তোলার আশা কোনো ছোট পত্রিকার সম্পাদকই করে না—তবে পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশের জন্য কিছু টাকা সংগ্রহ না করলে তো চলেই না।

বিজ্ঞাপন চাইতে গেলেই তাকে সবচেয়ে বেশী হতমান হতে হয়। সে মনে করে তার পত্রিকার মর্ম কেউ বুঝতে পারছে না। অপর পক্ষে বিজ্ঞাপনদাতা ভাবছে, এই রকম পত্রিকা তো হাজারটা বেরুচ্ছে, আর পারি না।

হাজারটা না বেরুলেও এ-রকম পত্রিকা বেশ কিছু বেরোয়। এ বিষয়ে এই বিভাগে আমরা আগেও কয়েকবার আলোচনা করেছি। কলকাতা শহর থেকে প্রায় একশো কাগজ নিশ্চিত বেরোয়, এ-ছাড়া অন্যান্য সমস্ত শহর থেকেই একটি বা দুটি। অধিকাংশ পত্রিকাই স্বল্পজীবী, তবে প্রবাদপ্রসিদ্ধ পাখির মতনই এর ঘন ঘন পুনর্জন্ম হয়।

এখন কথা হচ্ছে, এই রকম পত্রিকা কেন বেরোয়? দেশের এ রকম দুর্দিনেও এই সব পত্রিকা বাড়ছে ছাড়া কমছে না। আমরা এটাকে একটা সুলক্ষণই মনে করি। এই দুর্দশাগ্রস্ত দেশেও সংস্কৃতির প্রতি টান কমে না কিছুতেই। একথা এখন সর্বস্বীকৃত যে বাঙালী ছেলেদের সাহিত্যের প্রতি টান একটু বেশী—দুই বাংলাতেই।

বাঙালী ছেলেরা সঙ্গীত, শিল্পকলা বা খেলাধুলোয় এখন আর তেমন একটা এগিয়ে নেই। ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের জগতে বাঙালী গায়ক প্রথম শ্রেণীর একজনও নেই। ভারতের আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে বাঙালী শিল্পীদের স্থানও এখন খুব উঁচুতে নয়। বেশ কয়েকজন ভালো শিল্পী আছেন ঠিকই, কিন্তু সব মিলিয়ে বাংলার চিত্রশিল্পের মান সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নয়। খেলাধুলোর ব্যাপারটাই বা কী? ক্রিকেটের টেস্ট ম্যাচ হলে কলকাতার মাঠে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী দর্শক সমাগম হয়—কিন্তু কত বছর ধরে একজনও বাঙালী খেলোয়াড় ভারতীয় ক্রিকেটের টেস্ট টিমে কীর্তি রাখতে পারে নি? ফুটবলে কিছুটা কৃতিত্ব থাকলেও কলকাতার টিমগুলিতে অন্য প্রদেশ থেকে খেলোয়াড় আমদানি করতে হয় অনেক।

অপরপক্ষে, খাদ্যাভ্যাস বা পারিবারিক গঠন যে-কারণেই হোক, অনেক বাঙালী ছেলেই একটু ভাবপ্রবণ হয়। হয় তারা যৌবনেই বন্দুক-পিস্তল ধরে, অথবা কলম। বন্দুক-বোমাধারীদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। কিন্তু কলম যারা ধরে তাদেরই প্রকাশ আমরা দেখি এই সব পত্র-পত্রিকায়। এই সব পত্র-পত্রিকা থেকেই কিছু কিছু লেখক উঠে আসে প্রথম শ্রেণীতে। এই সব পত্র-পত্রিকা একটি প্রকৃষ্ট অনুশীলন ক্ষেত্র।

এই পত্র-পত্রিকার একটি শ্রেণীর লেখকরা খুব রাগী হয়। তারা সব কিছুর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করতে চায়। এই বিদ্রোহও অত্যন্ত প্রথাসম্মত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দেখলেই আমরা এই রকম বিদ্রোহের তরঙ্গ দেখতে পাবো অনেক।

নীলদর্পণ

সম্প্রতি নীলদর্পণ নাটক এবং তার অনুবাদ সম্পর্কে একটা বেশ উপভোগ্য বাদানুবাদ চলেছে। রাতারাতি এই নাটকের রচনা, মাইকেলকৃত অনুবাদ, প্রকাশক হিসেবে পাদ্রী লঙ সাহেবের আদালতে দণ্ড এবং ছোকরা জমিদার কালীপ্রসন্ন সিংহের তৎক্ষণাৎ জরিমানার হাজার টাকা (কেউ কেউ বলেন, দশ হাজার টাকা কিংবা তারও বেশী) ঝনাৎ করে ফেলে দেওয়া—এই সব নাটকীয় ঘটনার সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। এখন গবেষকরা এই নাটকের রহস্য আরও ঘনীভূত করে তুলছেন। অনুবাদ কর্মের সঙ্গে মাইকেলের যোগাযোগ প্রায় অবাস্তবই মনে হচ্ছে, বঙ্কিমবাবু তা হলে মাইকেলের নাম জড়ালেনই বা কেন—বঙ্কিমবাবুর বদলে সঞ্জীবচন্দ্র যদি লেখার মধ্যে ঐ কথাটা জুড়ে দেন; তা হলে বঙ্কিমবাবু কেন প্রতিবাদ করলেন না—তিনি তাঁর এই উচ্ছৃঙ্খল দাদাটিকে মাঝে মাঝে তিরস্কার করতে তো ছাড়েননি—এ সবের এখনো সঠিক উত্তর নেই। নীল আন্দোলন তো দূরের কথা, দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গেই মাইকেলের আদৌ কোনো সুসম্পর্ক ছিল কি না—সেটাও চিন্তার বিষয়।

যা-ই হোক, কোনো বইকে কেন্দ্র করে একটা বিতর্ক শুরু হলেই আমার স্বভাব সেই বইটা আর একবার পড়ে ফেলা। কলেজ জীবনের প্রথমে নাটকটা একবার পড়েছিলাম, দু-একটি টুকরো টুকরো দৃশ্য ছাড়া বিশেষ কিছুই মনে ছিল না। এখন আমি ছাত্রও নই, গবেষকও নই, সুতরাং আমার কোনো দায় নেই—ভয় ছিল, শেষ পর্যন্ত পড়তে পারবো কি না। না, পড়া যায় এখনো, বেশ আগ্রহের সঙ্গেই পড়া যায়। গিরিশবাবু ক্ষীরোদপ্রসাদ এমন

কি দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখের নাটক এখন শখ করে পড়তে গেলে বেশী এগুতে পারবো না।

বঙ্কিমবাবু অত্যন্ত স্পষ্টভাষী ছিলেন, কারুকেই ছেড়ে কথা বলতেন না। দীনবন্ধুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এবং নানা প্রসঙ্গে প্রশংসা সত্ত্বেও এই নাটকটিকে তিনি উচ্চ মূল্য দেননি। তিনি বলেছিলেন, "নীলদর্পণকার প্রভৃতি যাঁহারা সামাজিক কুপ্রথার সংশোধনার্থ নাটক প্রণয়ন করেন, আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহারা নাটকের অবমাননা করেন।" বঙ্কিমবাবুর এ-ধারণা অনেকখানিই যুক্তিসঙ্গত। এই শতাব্দীর সিকি ভাগের পর থেকে যে হাওয়া উঠেছে সাহিত্যকে একটা কিছু গঠনমূলক বক্তব্যের বাহন হতে হবে, বঙ্কিমবাবু তার ধার ধারেননি। এবং গত শতাব্দীর শেষে অনেক আদর্শবান পুরুষ বহু বিবাহ রোধ, বিধবা বিবাহ সমর্থন, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, নারী শিক্ষা, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের বিষয় নিয়ে ভূরি ভূরি বই লিখেছেন এবং বাংলা সাহিত্যের জঞ্জাল বাড়িয়েছেন। তাদের দ্বারা না হয়েছে উদ্দেশ্যের সাধন, না হয়েছে রসসৃষ্টি। বই এমনই একটা জিনিস, পাঠকরা না পড়লে যার কোনো মূল্যই নেই, সমালোচকরা তাকে যতই বাহবা দিন, প্রগতি-বাদীরা যতই পিঠ চাপড়ান। সুনির্দিষ্ট আশাবাদ এবং রাজনৈতিক বিধান-মানা রচনা কদাচিৎ সার্থক হয়।

তবে, নীলদর্পণ একটি উদ্দেশ্যমূলক নাটক হলেও অনেকখানি সার্থকতা অর্জন করতে পেরেছে। দীনবন্ধু ছিলেন একজন সাহিত্যিক, শ্লোগানসর্বস্ব আদর্শবাদী মাত্র নন, এমনকি নীল আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগও তেমন গভীর ছিল কি না সন্দেহ, নিজের নামও তিনি জানাননি। অনেকটা ভাড়াটে সাহিত্যিকদের মতনই তিনি একটা নাটক লিখে দিয়েছিলেন তবু সেটা অনেকটা সার্থক করেছেন স্রেফ প্রতিভার জোরে—মাঝে মাঝে যে আবেগ তিনি সঞ্চালিত করতে পেরেছেন তা একজন

সাহিত্যিকের পক্ষেই সম্ভব, সংলাপের মৌলিকত্বেও তাঁকে চেনা যায়।

নাটকের শুরুটি দেখে বোঝা যায়, তিনি কাহিনীর কাঠামো বিষয়ে ঠিক মনঃস্থির করতে পারেননি। গোলোক বসুর বাড়িতে রায়তদের কথোপকথন দিয়ে নীল চাষের অবস্থাটা তিনি বুঝিয়ে দিতে চান। কিন্তু সেটা এমন তাড়াহুড়ো করে বলা প্রকৃত নাট্যকারের কাজ নয়। নবীনকে নায়ক চরিত্র হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ব্যস্ত। এই নাটকের প্রকৃত নায়ক যে তোরাপ, তার কোনো ইঙ্গিতই নেই। আমার সন্দেহ হয়, নাটক লিখতে শুরু করার সময় তোরাপের কথা তিনি একবারও ভেবেছিলেন কি না। তাহলে তিনি ঐ চরিত্রটির প্রতি আর একটু যত্ন নিতেন।

সৈরি সরলতা আর আহুরীর কথোপকথন তো নেহাত খেলাচ্ছলে লেখা। দীনবন্ধু মিত্রের মতন একজন লেখকের পক্ষে ঐরকম কয়েক পাতা রচনার জন্য বেশী মাথা ঘামাতে হয় না, কথার পিঠে কথা আসে, আহুরীর মতন টাইপ চরিত্র গত-শতাব্দীর বাংলা নাটকে খুবই সুলভ। ক্ষেত্রমণিকে আনার পর তিনি পাঠকদের একটু সজাগ করে তোলেন কারণ এখানে আদিরসের গন্ধ আছে। কে না জানে, পাঠককে ধাক্কা দিয়ে সজাগ করার জন্য কিঞ্চিৎ আদিরসের আমদানি পৃথিবীর বহু লেখকেরই একটা অভ্যস্ত কৌশল মাত্র। নীতিবাগীশরা এখান থেকে প্রতিবাদ করার জন্য এবং অন্যরা উপভোগ করার জন্য একাগ্র হয়।

সধবার একাদশীতেও এ-রকম চটুল আদিরসের ইঙ্গিত অনেক জায়গায় আছে বটে, কিন্তু নীলদর্পণে তার প্রকৃতি ভিন্ন। এখানে তিনি আদিরসের সঙ্গে গোড়া থেকেই একটা ট্র্যাজেডি মিশিয়ে দিতে পেরেছেন। ক্ষেত্রমণি এই নাটকের সবচেয়ে সার্থক চরিত্র, তা বলা-ই বাহুল্য।

আপশোসের বিষয়, নাটকটি বড়ই ছোট। তোরাপ আসবার

পর, আমাদের আকাঙ্ক্ষা জাগে, আরও অনেক কিছু ঘটবে। কিন্তু তিনি সে সময় দিলেন না। হুড়্‌স হাড়্‌স করে সব কিছু ঘটিয়ে দিলেন। সাহেব দুটির চরিত্র—এই বইয়ের সবচেয়ে দুর্বল রচনা। এখানে তিনি আর সাহিত্যিক নেই, নিছক প্রচারবাদী হয়ে পড়েছেন। এখানে তিনি ভুলে গেছেন যে, দুর্বৃত্ত চরিত্রও যদি অবাস্তব হয়, তা হলেও বক্তব্যের ঠিক মর্মটি আর পৌঁছয় না। ক্ষেত্রমণির ওপর বলাৎকারের দৃশ্যটি—যা মঞ্চে দেখে বিদ্যাসাগর মশাই জুতো ছুড়ে মেরেছিলেন এমন গুজব রটেছিল—(বিদ্যাসাগর সত্যিই অবশ্য জুতো ছুঁড়ে মারেননি, তিনি নীলদর্পণের অভিনয় দেখেনই নি—ইন্দ্র মিত্র মহাশয় তা প্রমাণ করে ছেড়েছেন)—সেই দৃশ্যটি দাঁড়িয়ে গেছে শুধু ক্ষেত্রমণির সংলাপে—নচেৎ, দৃশ্যটি আধুনিক হিন্দী সিনেমা ছাড়া আর কিছুই না। সাধারণ পাঠক হিসেবে আমার মনে হলো, ঐ দৃশ্যে তোরাপের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল রোগ সাহেবকে খুন করা এবং পলাতক হয়ে যাওয়া। পরবর্তী ঘটনা ঘটা উচিত ছিল তোরাপকে নিয়েই—কিন্তু দীনবন্ধু আর সেদিকে গেলেন না, তিনি যে নবীনচন্দ্রকে নায়ক করবেন, আগেই ঠিক করে ফেলেছেন! নবীনচন্দ্রকে মারা, তার বউকে কাঁদানো, তার মাকে পাগল করা—এই সব দৃশ্যগুলিতে সাহিত্য-ট-ইত্য গোল্লায় গেছে। এখানে তিনি গত শতাব্দীর মঞ্চের দর্শকদের কথাই শুধু ভেবেছেন, কিংবা তাঁর উদ্দেশ্য প্রকট করার জন্য যা-যা দরকার তা-ই এনেছেন—এই সব অংশ বঙ্কিমবাবু পছন্দ করবেন কী করে?

নীল আন্দোলনের সময় এই নাটক কতটা কাজে লেগেছিল, সেই বিচার করে নীলদর্পণ এতদিন টিঁকে থাকেনি। এর আংশিক সাহিত্য-সাফল্যের জন্যই এটাকে এখনো একটি সৎ উদ্দেশ্যযুক্ত সার্থক রচনার অতি বিরল উদাহরণ হিসেবে ধরা যায়। কুলীনকুলসর্বস্ব ইত্যাদি যেমন টেঁকেনি।

অনেকের ধারণা, কবির সংখ্যা বুঝি বাঙালীদের মধ্যেই খুব বেশি। কেউ বলে থাকেন, পৃথিবীতে বাঙালীরাই সবচেয়ে বেশী কবিতা লেখে। ধারণাটা অমূলক। পৃথিবীর সব দেশেই উঠতি বয়েসী ছেলেদের মধ্যে (সামান্য সংখ্যক মেয়ে) অনেকেরই কবিতা লেখার শখ করে। অবশ্য আমড়া গাছের পাতার মতন অনেকেই কিছুদিনের মধ্যে ঝরে যায়। তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছর পার হবার পরও যারা কবিতা লেখে—তাদেরই প্রকৃত কবির দলে ফেলা যায়। বয়স্ক কবির সংখ্যা সব দেশেই কম। অর্থাৎ কবিতা জিনিসটা হয় প্রথম-যৌবনেই লেখার মতন ব্যাপার—অথবা, প্রথম যৌবনের নেশা কেটে যাবার পর কবিতার নেশাও কেটে যায়।

অন্য দেশেও যে কবিদের সংখ্যা বিপুল, তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমেরিকার নিউ ইয়র্কার পত্রিকা সম্প্রতি কবিদের কাছে একটি চিঠি পাঠাচ্ছে। চিঠির কপি ছাপা হয়েছে টাইম সাপ্তাহিকে। চিঠির বয়ান এই রকম, প্রিয় শ্রীঅমুক, আমাদের দপ্তরে এত বেশী কবিতা জমে গেছে যে আমাদের কবিতা-গ্রহণ-বিভাগটি ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বন্ধ করে দিচ্ছি। এখন আর আমাদের কবিতার কোনো প্রয়োজন নেই। সুতরাং আপনার প্রেরিত কবিতাটি আমরা না-পড়েই ফেরত পাঠাচ্ছি। যা-ই হোক, আপনি যে কবিতাটি পাঠিয়েছিলেন—এজন্য ধন্যবাদ।

আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকায় অবশ্য কবিতা ফেরত পাঠাবার কোনো প্রথা নেই। কিন্তু সাহেবরা এখনো অনেক রকম নিয়মকানুন মানে। কবিতাও ফেরত পাঠায়। কিন্তু না-পড়ে

ফেরত পাঠাবার স্বীকৃতি কোনো সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে এই প্রথম পাওয়া গেল।

সত্যি, কবিতা অনেকেই লেখে। বিশেষত বয়ঃসন্ধিকালে অনেকের মধ্যেই এই প্রবণতা দেখা যায়। যে-বাড়িতে আর কেউ কবি নয়, সে-বাড়িতে হঠাৎ দু-একটি বালক কেন যে কবিতা মেলাতে শুরু করে, সেটা একটা বিস্ময়ের বিষয়। কেউ কেউ বলে থাকেন ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তির আদিকালে কবিতাই ছিল একমাত্র বাহন। সুতরাং কোনো বালক যখন ভাষা শিখতে আরম্ভ করে, তখন সেই আদিকালের প্রথায় প্রথমে পদ্যের দিকেই ঝোঁক আসে। তা হলে তো বলতে হয়, যারা সারা জীবনে কখনো পদ্য মেলায়নি—তারা একেবারেই ট্র্যাডিশন থেকে বিচ্যুত এবং তারাই আধুনিক।

বাড়িতে কোনো বাচ্চা যখন পদ্য মিলিয়ে কথা বলে কিংবা পদ্য মুখস্থ বলে, বাড়ির লোক খুশী হয়। অন্যদের ডেকে শোনায়। কিন্তু সেই বাচ্চাটিই স্কুলের ওপরের ক্লাসে উঠে কিংবা কলেজে ভর্তি হয়ে কবিতা রচনা চালিয়ে গেলে সেটা অভিভাবকদের মোটেই মনঃপুত হয় না। কেউ কেউ রীতিমত অত্যাচার শুরু করেন। এটা হয়, বোধ হয় এই কারণে যে, কবিতা রচনার সঙ্গে একটা অনিশ্চয়তা জড়িয়ে আছে। কবিতা লেখা মানেই পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাওয়া। সবাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয় না, কিংবা রবীন্দ্রনাথের জমিদারী ছিল তাই লিখতে পেরেছেন···এমন মন্তব্য প্রায়ই শোনা যায়।

কবিতা রচনার মধ্যে যে একটা অনিশ্চিত জীবনের সম্ভাবনা রয়েছে, এটাকে মিথ্যেও বলা যায় না। কবিদের মধ্যে আত্মঘাতীর সংখ্যা বিরল নয়। সাংসারিক অর্থে সার্থকতা এদের জীবনে কদাচিৎ আসে। কবি মাত্রই দুঃখী। বাইরে থেকে যাদের সার্থক কিংবা প্রতিষ্ঠিত মনে হয়—তাদেরও নিজস্ব জীবন অতিশয় দুঃখের। কেউ কেউ বলেন যে, কবিতা লেখার সময় মাথার মধ্যে এমন একটা আলোড়ন শুরু হয় যে তার চাপ সহ্য করা সম্ভব নয় সব সময়।

সেই চাপ কাটাবার জন্যেই কবিরা নানা রকম বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিতে চায়। এবং বিলাসিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে নিজেকে কষ্ট দেওয়া। যারা অসুস্থ স্বভাবের লোক—তারা আরামটাকে বিলাসিতা মনে করে—অথচ পৃথিবীর যাবতীয় নেশার উৎপত্তি হয়েছে শরীর বা মনকে নিপীড়িত করার জন্য।

ফরাসী দেশে এক সময় কবি পরিচয় দিলে সে যুবকের কোনো প্রেমিকা জুটতো না। আমাদের দেশেও কিছুকাল আগে অন্তত এই অবস্থা ছিল, এখন কী রকম, ঠিক জানি না। চাকরি-বাকরি বা জীবিকার্জনের পথেও এদের অনেক বাধা। রামপ্রসাদ হিসেবের খাতায় কবিতা রচনা করেও নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন—কিন্তু এখন কেউ সেরকম পাবে বলে মনে হয় না। এত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও কবিরা অবদমিত, চিরকাল কবিতা লেখা হয়ে চলবেই। বড় বড় পত্রিকা থেকে তেমন সুযোগ না পেলেও লিটল ম্যাগাজিনের প্রতাপ অপ্রতিহত। এবং রিলকে আশা প্রকাশ করেছেন, একদিন এই পৃথিবী আবার কবি ও মেষপালকে ভরে যাবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বয়েস হলো আশী বছর। এই প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য কত সুমহান কিংবা কোন্ কোন্ মনীষী এর সঙ্গে নানা সময়ে জড়িত ছিলেন সেই ইতিহাসের পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। মোট কথা এটি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হলেও বেশ কয়েক বছর এর অস্তিত্ব ঠিক মতন অনুভব করা যায় না। মাঝে মাঝে মিটিং হয়, কাগজে বিবৃতিও দেখতে পাই, কখনও কখনও কর্মকর্তাদের মধ্যে দলাদলির খবরও ভেসে আসে, আর কিছু না। অতি মূল্যবান গ্রন্থাগারটিতে দু-একবার গিয়ে দেখেছি। অতি জীর্ণ দশা। এই পরিষদের প্রতিষ্ঠার যে উদ্দেশ্য, 'বিবিধ উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতি সাধন'—তার কতটা সুরাহা হলো কে জানে।

কী উপায়ে এই প্রতিষ্ঠানকে আরও সবল ও সক্রিয় করে তোলা যায় সে-সম্পর্কে কোনো পথ নির্দেশ করার ক্ষমতা আমার নেই, তা হলে আমিই তো একজন কেউকেটা হয়ে যেতাম। সাহিত্যের একজন দীন সেবক হিসেবে আমি এই প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতার জন্য দুঃখ অনুভব করি এবং মনে করি, বাংলা ভাষার এরকম একটি গুরুজন থাকার বড় দরকার ছিল।

সাহিত্য কারুর খবরদারি গ্রাহ্য করে না, ব্যক্তিগতভাবে লেখকরা কারুরই অধীন নয়। কিন্তু ভাষাকে সুসমঞ্জস করার জন্য বিদ্বান-মণ্ডলীর সচেতন প্রয়াস থাকলে বড় ভালো হয়। এখন পর্যন্ত বাংলা বানানের কোনো নির্দিষ্ট নীতি ঠিক হলো না। এটা কে ঠিক করবে? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা তো আর কহতব্য নয়। কোনো

একটি সংবাদপত্র এ ব্যাপারে অগ্রণী হলে, অন্য সংবাদপত্রগুলি তা মেনে নেবে না। এখন এক-একটা সংবাদপত্রে এক-এক রকম বানান অনুসৃত হচ্ছে। একই লেখকের বই বিভিন্ন প্রকাশক প্রকাশ করছেন বিভিন্ন বানানে। পাঠ্য পুস্তকে এক বানান আর গল্পের বই কিংবা খবরের কাগজে অন্য বানান—এরকম অরাজকতা কি কোনো ভাষায় চলে? কোনো কোনো লেখকের কিছু নিজস্ব বানানের বাতিক আছে। এটা সম্ভব হচ্ছে তার কারণ সঠিক মান নেই, কেউ জোর করে বলতে পারে না অমুক বানানটা ভুল। নোতুন, নতুন, নূতন—তিন রকমই চলছে। বোলবো বলব্ বলবো—এরকমও দেখছি আকছার। গিয়েছিলাম এবং গিয়েছিলুম—খুব কাছাকাছিই দেখা যায়।

বানান ছাড়া আছে নতুন শব্দের ব্যাপার। শুনেছি ফরাসী ভাষায় যখন কোনো বিদেশী শব্দ ঢুকে পড়ে তখন ফরাসী অ্যাকাডেমী সেই শব্দটাকে নেড়েচেড়ে বাজিয়ে দেখে, যদি পছন্দ হয় তা হলে স্বীকৃতির ছাপ মেরে বানান ঠিক করে দেন। আমাদের এখানে তো যার যা খুশি শব্দ যে-কোনো বানানে চালিয়ে দিচ্ছে।

যে ভাষার এই রকম অবস্থা তা নিয়ে গর্ব করার মধ্যে কিছুটা আত্মপ্রবঞ্চনারও ব্যাপার আছে নিশ্চিত। সুতরাং ভাষাকে সুনির্দিষ্ট করার দায়িত্ব কার হাতে থাকবে, এটা একটা বড় প্রশ্ন। সাহিত্য আকাদেমির একটা শাখা কলকাতায় আছে—কিন্তু যেহেতু সেটা সরকারী ব্যাপার, তাই তার কাছে আমাদের আশা করার প্রায় কিছুই নেই। সেই জন্যই বারবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কথা মনে পড়ে।

বয়সের ভারে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ জীর্ণ। এটাকে পুনর্জীবন দানের কথা উঠলেই নিশ্চিত টাকা নেই, টাকা নেই রব উঠবে। সন্দেহ কি, এই প্রতিষ্ঠান থেকে সরকারী সাহায্য পাবার অবিরাম চেষ্টা চলছে। সরকারী-মুখাপেক্ষী হবার সুবিধে এই যে, তাতে সব দোষ সরকারের ওপরে চাপানো যায়। আর সরকারী ব্যবস্থাতে

ফাইল চালাচালি হয় মাসের পর মাস, কোনো মন্ত্রী হয়তো পট করে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েই দিল্লি চলে যান, তারপর ওঠে আইনের নানা ক্যাঁকড়া।

সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার গোড়ার মুখে পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিভিন্ন জমিদার। এখন জমিদারদের দিন গেছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠী সমাজ তো গড়ে উঠেছে। সরকারী আনুকুল্যের বদলে এই শ্রেষ্ঠী-সমাজের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া বোধ হয় সহজ। বাঙালী ব্যবসায়ীর সংখ্যা কম হলেও নগণ্য নয়—এবং যে-সব অবাঙালী ব্যবসায়ী দু' তিন পুরুষ ধরে এখানে অবস্থান করছেন—তাঁদেরও এ ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করার প্রস্তাব দেওয়া যেতে পারে। আসল ব্যাপার হচ্ছে একটা রেওয়াজ তৈরি করা। বাস-যাত্রীদের জন্য আচ্ছাদন তৈরি করে দেয় যারা, তারা কি বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্যও কিছু দিতে পারে না?

এই সব কথা মনে এলো তার কারণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার-এর নাম স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্র আমাদের হাতে এসেছে। তাতে বলা হয়েছে, এই পরিষদের উদ্যোগে বাংলা ভাষার একটি সর্বব্যাপী অভিধান রচনার তোড়জোড় শুরু হয়েছে, এঁরা চান উৎসাহী কর্মীদের সাহায্য। টাকার অভাবের কথাটাও বাদ পড়েনি। খুব সোজা কথায় বলি, আমি অভিধান রচনার প্রস্তাবে খুব একটা আশান্বিত বোধ করিনি। খুব সম্ভবত এ-কাজ সম্পূর্ণ হবে না, প্রস্তাবেই থেকে যাবে। অন্তত ভূগর্ভ রেল এবং এই অভিধান—কে কত দেরিতে সম্পূর্ণ হবে—এই নিয়ে যে একটা প্রতিযোগিতা থাকবেই, সে ব্যাপারে বাজি ফেলা যেতে পারে। যে প্রতিষ্ঠান নিজেই এখন দুর্বল, সাহিত্যজগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, তার পক্ষে এত বড় একটা কাজ হাতে নেওয়া, মনে হয়, অবিমৃষ্যকারিতা। তার আগে এ-দেশের সমস্ত লেখক, গবেষক এবং বিদ্বজ্জন যাতে এই প্রতিষ্ঠানকে আপন মনে করতে পারেন সে-রকম একটা পরিবেশ গড়ে তোলা উচিত।

নাট্যকার আরাবাল

বর্তমান পৃথিবীর নতুন নাট্যকারদের মধ্যে আরাবাল একটি সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের প্রতিভা। তুলনা দিয়ে বোঝাতে গেলে তাঁকে বলা যায় মঞ্চের চার্লি চ্যাপলিন (প্রথম দিককার)। এই উদ্ভট গোলমেলে পৃথিবীতে তাঁর চরিত্রগুলো বড়ই সাধারণ আর সরল—এত সরল যে, তাদের ব্যবহার, কথাবার্তায় আমাদের হাসি পাবে। যেমন, তাঁর একটি নাটকে, একজোড়া স্বামী-স্ত্রী—একটা যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে এসেছে পিকনিক করতে। চারদিকে দারুণ যুদ্ধ, গোলাগুলি ছুটছে—ওরা তারই মধ্যে ওসব কিছু অগ্রাহ্য করে খাবারের তারিফ করছে—যুদ্ধ খুব বেশী ঘোরালো হলে ওরা বড়-জোর ছাতা দিয়ে মাথা আড়াল করছে—এবং বৃষ্টি থেমেছে কি না দেখার মতন ওরা ছাতার বাইরে হাত বাড়িয়ে দেখে নিচ্ছে গোলা-বর্ষণ বন্ধ হয়েছে কি না। এসব দেখে আমাদের হাসি পাবারই কথা। আর একটি নাটকে, একটি মৃত শিশুর কফিনের দু-পাশে স্বামী-স্ত্রী বসে বলছে—এখন থেকে আমরা খুব ভালো হবো।

আরাবাল জাতে স্প্যানীশ, লেখেন ফরাসীতে। বয়েস বেশী নয়, ৩৬ বৎসর মাত্র, বেশ কুদর্শন, বেঁটে, গোলালো চেহারা, সরু করে ছাঁটা দাড়ি ও গোল চশমা। ব্যবসায়িক মঞ্চ তাঁকে এখনও গ্রহণ করেনি, কিন্তু আধুনিক সাহিত্য-পাঠকদের কাছে আরাবাল একটি প্রিয় নাম। সব মিলিয়ে, আরাবাল যেন একটি বয়স্ক শিশু। তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলির মধ্যে ইংরেজিতেও পাওয়া যায়, "অটোমোবিল গ্রেভইয়ার্ড", "টু এক্সিকিউশনার্স", "পিকনিক অন দা ব্যাটেল ফিল্ড" ইত্যাদি।

কিছুদিন আগে আরাবালের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ বেরিয়েছিল 'এভার গ্রীন' কাগজে। সেই বিবরণটিতে আরাবালের চরিত্র বেশ বোঝা যায়। আমরা তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধার করে দিচ্ছি। ইণ্টারভিউ নিয়েছিলেন একজন মহিলা, অ্যান মরিসেট—তিনি আফরিকায় শিক্ষা-বিস্তার যোজনায় কাজ করেন। প্রথমে একটা রেস্টুরেণ্ট এবং পরে মেয়েটির বাড়িতে কথাবার্তা চলে ফরাসী ভাষায়।

প্রশ্ন : আপনি কী খাবেন? চা? কফি? এই দোকানে মদ দেয় না।

আরাবাল : জানি। আপনি কী খাচ্ছেন?

অ্যান : স্যুপ।

আরাবাল : ঠিক আছে। (ইংরেজিতে) বেয়ারা, আমার জন্যও...

অ্যান : আপনি কি কলামবিয়া-তে ইংরেজি পড়ছেন?

আ : হ্যাঁ। কিন্তু ওরা শিগগিরই আমাকে তাড়াবে।

অ্যান : কেন?

আ : ওরা আমাকে ঘেন্না করে।

অ্যান : কেন?

আ : সবাই আমাকে ঘেন্না করে, ছাত্ররা, অধ্যাপকরা, ফোর্ড ফাউনডেশান—সবাই।

অ্যান : আপনার এখানে কোনো বন্ধু নেই?

আ : না, সব শত্রু। কিন্তু আমার ক্রীতদাস আছে।

অ্যান : ক্রীতদাস?

আ : হ্যাঁ। ক্রীতদাস। আমি ওদের হাতে হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে রাখি—হ্যাণ্ডকাফ কাকে বলে জানো তো? সেই—দোকানে ওরা এসে খেতে চায়—লোকেরা তাই রেগে ওঠে।

অ্যান : রেগে ওঠে?

আ: হুঁ। আমার ওপর—আমি ওদের হাতে হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে রেখেছি—তাই ওরা খেতে পারে না।

অ্যান: আপনি ওদের নিয়ে আর কী করেন?

আ: অনেক কিছু। সুড়ঙ্গ ট্রেনে আমি যখন ওদের নিয়ে ঘুরি—তখন আমি অন্ধদের জিজ্ঞেস করি, তুমি কি কম্যুনিস্ট? তারা বলে, না। আমি বলি, খুব খারাপ, কেননা, আমি নিজে কম্যুনিস্ট। রাজনীতিতে আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই—কিন্তু তবু আমি ওই কথা বলি। আমার চাকররা তাই শুনে হাসে। আমি তখন সিঁড়ি দিয়ে ওদের ওপর-নিচ করাই, বার-বার।

অ্যান: আপনার এতে ভালো লাগে?

আ: না।

অ্যান: তবে এরকম করেন কেন?

আ: এতে আমি বেঁচে থাকার স্বাদ পাই!

অ্যান: ওদের সঙ্গে আপনার রোজ দেখা হয়?

আ: রোজ। ওরা আমার চেয়ে অনেক বেশী চালাক।

অ্যান: আপনি কি বিবাহিত?

আ: হুঁ।

অ্যান: কোনো সন্তান—

আ: না, কোনোদিন না।

অ্যান: কোনোদিন না কেন?

আ: আমি কুমার। আমাকে চিরকুমার থাকতেই হবে!

(বাড়িতে)

আরাবাল: (মদের বোতলের কর্ক খুলে) এই ব্যাপারটা খুব উত্তেজনা দেয়। এর মধ্যে একটা বেশ যৌন রূপক আছে।

অ্যান: সব কিছুই আপনার কাছে—

আ: নিশ্চয়ই! যৌন রূপক না থাকলে কোনো কিছুই আকর্ষণীয় হয় না।

অ্যান : আকর্ষণীয় ? তার মানে—এই একটা ব্যাপার আপনার ভালো লাগে ?

আ : মোটেই না ! আমি সব কিছু ঘৃণা করি, নিজেকে ছাড়া।

অ্যান : কখনো আপনি নিজেকেও ঘেন্না করেননি ?

আ : মাঝে মাঝে···তুমি মার্কুইস দ্য সাদের লেখা পড়েছ ?

অ্যান : না, বিশেষ কিছু না।

আ : ভালো না। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, খুব দুষ্টু ছিলাম, মা আমার উরুতে দড়ি বেঁধে শাস্তি দিতেন—তাতে আমার খুব উত্তেজনা হতো, আমার খুব ভাল লাগতো······তোমার এখানে দড়ি আছে ?

অ্যান : না। কেন ?

আ : তা হলে আমি তোমাকে বেঁধে ফেলতে পারতুম, অথবা তুমি আমাকে বাঁধতে। আমি আমার ক্রীতদাসদের বেঁধে রাখি। ওদের খুব ভালো লাগে। ওরা আমাকে ওদের মেরে ফেলার জন্য মিনতি করে। কিন্তু আমি মারি না।

অ্যান : আপনার নাটকগুলো কি সব এই রকমই ?

আ : বোধ হয়। কিন্তু ওগুলো তো আমি লিখি না। প্যারিসে আমার চাকররা ওগুলো লেখে। দড়ি দিয়ে বাঁধলে তোমার ভালো লাগবে না ? আমার মা আমাকে বিছানার সঙ্গে বেঁধে রাখতেন শাস্তি দেবার জন্য।

অ্যান। আপনার মা কী রকম ছিলেন ?

আ : খুব ধর্মভীরু। খুব ! এখন অবশ্য পাগল। আমাকে বেঁধে রেখে তিনি আমার গায়ের ওপর বসতেন।···তুমি খালি আমার মায়ের কথা জিজ্ঞেস করছো কেন ?

অ্যান : আপনার বাবা কী রকম ছিলেন ?

আ : আমি তাঁর সম্বন্ধে কথা বলতে চাই না। মা ওঁকে ঘেন্না করতেন।

অ্যান : কী অদ্ভুতভাবে আপনার শৈশব কেটেছে।

আ : তোমার ধারণা, আমি অদ্ভুত ?

অ্যান : একটু।

আ : মোটেই না। আমি স্বাভাবিক, তুমিই অদ্ভুত। বলো ঠিক কি না ? আমি অদ্ভুত ?

অ্যান : একটু। সেটা স্বাভাবিক—এর জন্যেই হয়তো আপনার কল্পনাশক্তি বেশী।

আ : তুমি আমাকে ঘৃণা করো ?

অ্যান : না। আপনি আমাকে ঘৃণা করেন ?

আ : হ্যাঁ।

অ্যান : তা হলে আপনি এখানে রয়েছেন কেন ?

আ : এতে আমার মজা লাগে। এতে আমি বেঁচে থাকার স্বাদ পাই। আমাকে দেখতে কেমন ? তোমার পছন্দ হচ্ছে ?

অ্যান : মন্দ না। অনেকটা শিশুর মতন।

আ : তোমার কি ধারণা আমাকে টুলুজ লোত্রেকশ্রর মতন দেখতে ? সবাই তা-ই বলে, একমাত্র স্যামুয়েল বেকেট-এর বউ ছাড়া। ওর ধারণা, আমাকে শুবার্ট-এর মতন দেখতে—এটা আমার বেশ পছন্দ। তোমার এখানে কোনো খেলনা আছে ?

অ্যান : খেলনা ?

আ : হ্যাঁ। যেমন ইলেকট্রিক ট্রেন ?

অ্যান : না। তবে আমার ঘরে দাবা আছে, খেলবেন ?

আ : এসো। আমি তোমাকে হারিয়ে দেবো—

[দাবা খেলা শুরু হলো, অ্যান প্রথমে জিতছিল—হঠাৎ আরাবাল অ্যানের হাতটা টেনে নিয়ে খুব জোরে কামড়ে ধরলো। অ্যান বললো, হাত ছাড়ুন, আমি আঘাত ভালোবাসি না। আরাবাল সঙ্গে সঙ্গে বললো, আমি বড্ড সেন্টিমেন্টাল, কিন্তু খুব দয়ালু, আমি কারুর রক্ত বার করি না।—বাকি খেলায় আরাবাল জিতে গেল।

একটু বাদে আরাবাল বললো, তুমি একটা হাস্যকর মেয়ে। তুমি পাগলের মতন আমার প্রেমে পড়ে গেছ বুঝতে পারছি। অ্যান বললো, একটুও না। আরাবাল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, যাক বাঁচলুম। অ্যান জিজ্ঞেস করলো, আপনার বুঝি প্রত্যাখ্যাত হতে ভালো লাগে? আরাবাল: খুব। এতে আমি বেঁচে থাকার স্বাদ পাই।]

বুলগেরিয়া কিংবা জাপান কিংবা চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে মাঝে মাঝে দু' একজন কবি কলকাতায় আসেন। একবার মঙ্গোলিয়া থেকেও দু'জন কবি এসেছিলেন—যে দেশের চেঙ্গিস খাঁ ছাড়া আর কোনো লোকের নাম আগে শুনিনি। ওঁরা এসে কলকাতার কবি-লেখক-সাংবাদিক-সম্পাদকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে চান—কখনো অফিসের টেবিলের উল্টোদিকে বসে, কখনো ঘরোয়া আসর ডেকে। এরকম দু'-একটি জায়গায় আমি দৈবাৎ উপস্থিত হয়েছি।

বেশ মজা লাগে। সুদূর দুই দেশের কবিদের মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম আত্মীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু 'কবি' শব্দটিই অনেক কাছাকাছি আনে। দু'জন ব্যবসায়ী বা দু'জন রাজনীতিকের মধ্যে দেখা হলে এরকম কোনো একাত্মবোধ আসতেই পারে না। কিন্তু মুশকিল এই, ভাষার দুস্তর ব্যবধানে হৃদয় উন্মোচিত হয় না। চেকোশ্লোভাকিয়ার একজন কবি একজন বাঙালী কবির সঙ্গে যখন কথা বলেন, তখন যোগাযোগের ভাষা হয় ইংরেজি, যে-টা কারুরই স্বতঃস্ফূর্ত ভাষা নয়। ফলে কতকগুলো অবান্তর, অর্থহীন, বোকা বোকা কথার বিনিময় হয় শুধু। আমি এ-পর্যন্ত এমন একজন বাঙালীকেও দেখিনি, মোটামুটি ঝরঝরে ইংরিজি বলার জন্য যিনি গর্বিত নন এবং মোটামুটি ঝরঝরে ইংরেজি বলতে না পারার জন্য যিনি একটুও হীনমন্যতায় ভোগেন না। তার ফলে এখানে স্বাভাবিক কথাবার্তা হতে পারে না। অন্য অ-ইংরেজিভাষী দেশের মানুষের হয়তো এ কমপ্লেক্স নেই—কিন্তু সেখানেও যোগাযোগ সম্পূর্ণ হয় না।

যা-ই হোক, এই সব সমাবেশে একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি যে, বাংলাদেশের কবিতা পৃথিবীর অন্যত্র কতখানি পরিচিত—এ-সম্পর্কে

জানার আগ্রহ বাঙালী কবিদের মধ্যে প্রবল। যে-কোনো কারণেই হোক, হয়তো রবীন্দ্রনাথের জন্যই, আমাদের ধারণা, বিশ্ব সাহিত্যে বাংলা কবিতার একটি বিশেষ স্থান আছে। বিশ্ব সাহিত্য বলতে অবশ্য পাশ্চাত্য সাহিত্যই আমাদের মাথায় আসে। ইজিপ্টের কবিরা বাংলা কবিতা সম্পর্কে উৎসাহী কি না—এ সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ নেই। ইংরেজের কাছে দীর্ঘকাল পরাধীন থাকার ফলে, আমাদের মধ্যে এই বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে যে, ইংরেজি সাহিত্য বা ইংরেজি সাহিত্যের ধারাই সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মান। এবং যে-হেতু ইংরেজি অনুবাদে প্রায় সমগ্রভাবেই ফরাসী-জার্মান বা রুশ সাহিত্য পাওয়া যায়—সেজন্য ওগুলোরও কিছু কিছু খোঁজখবর আমরা রাখি। কিন্তু কোনো ফরাসী যদি দৈবাৎ দাবি করে যে, নাট্যকার হিসেবে রাসিন শেক্সপীয়ারের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়—সেকথা আমাদের মন মানতে চায় না। যদিও আমরা বলি কালিদাস ভারতের শেক্সপীয়ার।

আমরা প্রাচ্যদেশীয় হলেও, প্রাচ্যদেশীয় সাহিত্য সম্পর্কে আমরা অন্ধ ও বধির। এখন চীনের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বন্ধ, কিন্তু যখন খোলা ছিল, তখনও বিরাট দেশ চীনের সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ছিল দারুণ রকম কম। লাও চাও-এর "রিক্সাওয়ালা", লু স্যুনের কয়েকটি গল্প ও কিছু ছোট ছোট প্রাচীন চীনা কবিতা—এই আমাদের সম্বল। ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কেও চীনের কৌতূহল বা আগ্রহ কতখানি ছিল—জানতে পারিনি। জাপানী সাহিত্য সম্পর্কেও ঐ একই অবস্থা—কিছু হাইকু আর ওসামু দাজাই-এর মত কোনো লেখককে নিয়ে ইংরেজি জগতে কিছু হইচই হলে সামান্য আগ্রহ। আমি এক্সপারট বা গবেষকদের কথা বলছি না, বলছি আমার মতন সাধারণ পাঠকের কথা। সিংহল কিংবা ব্রহ্মদেশে কি কোনোকালেই ভালো সাহিত্য রচিত হয়নি? এ কি কখনো সম্ভব? অথচ আমরা কোনো খবর রাখি না।

তাহলে বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কেই বা অন্যদেশের লোক আগ্রহী হবে কেন? মানুষের পক্ষে পৃথিবীর সব ভাষার সাহিত্যের তো খোঁজ খবর রাখা সম্ভব নয়। কারুর দায়ও পড়েনি। সাহিত্য পাঠ আনন্দের জন্য, কোনো দায়িত্ববোধের জন্য তো নয়। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষার সাহিত্যিকরাই নিজেদের সাহিত্য নিয়ে গর্ব করেন, বাঙালীরাও করবে। কিন্তু বিশ্বের কাছে বাংলা সাহিত্যের আলাদা বিশেষ কোনো মূল্য আছে বলে আমার মনে হয় না। জীবনানন্দ দাশকে ইংরেজি অনুবাদে তৃতীয় শ্রেণীর কবি মনে হয়—একথা বলেছেন একজন সহানুভূতিসম্পন্ন বিদেশী কবি। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ প্রসঙ্গ আর না তোলাই ভালো।

যা-ই হোক, কয়েকদিন আগে এক ফরাসী যুবক কলকাতায় এসে ফরাসী অনুবাদে একটি বাংলা কবিতার সংকলন প্রকাশ করার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করছিলেন। যুবকটি বাংলা কবিতা বিষয়ে প্রায় কিছুই জানেন না। ফরাসীরা সাধারণভাবেই বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষ সম্পর্কে অতি ক্ষীণ ধারণা নিয়ে বসে আছে। আমরা ফরাসী সাহিত্য বিষয়ে এত উৎসাহী, এর প্রতিদান দেবার ব্যাপারে ওদের কোনো গরজ নেই। আমার এক কবি বন্ধু ফরাসী যুবকটিকে সোজাসুজি একটু কঠোর ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বাংলা কবিতা সম্পর্কে কিচ্ছু জানো না, তবু বাংলা কবিতার অনুবাদ করার জন্য তোমার এত গরজ কেন হে? এ বইয়ের প্রকাশক পাবে তুমি? তোমাদের দেশের লোক পড়বে? আমরাই বা কেন আগ্রহী হবো?

যুবকটি আমতা আমতা করে বললো, তা অবশ্য ঠিক। তবে ব্যাপার কী জানো, আগে বাংলাদেশ বা কলকাতার কথা আমাদের দেশের খবরের কাগজে প্রায় বেরুতোই না। এখন প্রায়ই বেরোয়—তোমাদের এখানকার পলিটিক্যাল সিচুয়েশানের জন্য। তাই লোকের একটু একটু আগ্রহ জন্মাচ্ছে।

কী কাণ্ড! কবিতার সমাদরের কী মর্ম!

যতদূর জানা যায়, ঈশ্বর গুপ্তের উদ্যোগেই আমাদের এ-দেশে প্রথম আনুষ্ঠানিক কবি-সম্মেলন শুরু হয়। কলকাতার কোনো গৃহের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আমন্ত্রিত কবিরা কবিতা পাঠ করতেন। সভার শেষে ভূরিভোজন।

এর আগে, রাজসভায় কবিতা পাঠের কথা শোনা গেছে—কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে কবিতা পাঠের প্রবর্তন করে গেছেন ঈশ্বর গুপ্ত। তারপর থেকে বাংলায় এটি একটি বহুপ্রচলিত অনুষ্ঠান। এখন নানা উপলক্ষে কবি-সম্মেলনের আয়োজন হয়—কখনো কখনো এই সব সম্মেলনের সংখ্যাধিক্য বিস্ময়কর।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের আমলে কবিতার ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই ভাটা পড়েছিল। কবিতা পাঠ ও কবিতার বই বিক্রি এমন অসম্ভব কমে গিয়েছিল যে ধারণাই করা যায় না। পঞ্চম দশকের মাঝামাঝি অরুণকুমার সরকারের নেতৃত্বে কয়েকজন কবি কলকাতার জনবহুল রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে—ঠিক অফিস ভাঙা ভিড়ের সময়—"আরও কবিতা পড়ুন" এই আওয়াজ তুলে লোকজনকে সচকিত করেছেন এবং কবিতা পড়ে শুনিয়েছেন। এরই কাছাকাছি সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে (এখন তার অস্তিত্ব নেই) দু-দিনব্যাপী একটা বিরাট কবি-সম্মেলন হয়েছিল—উদ্যোক্তা ছিলেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, দিলীপকুমার গুপ্ত প্রমুখ। সেই সম্মেলনের সাফল্য ছিল বিস্ময়কর—প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল এবং জীবনানন্দ দাশ সমেত বাংলার সমস্ত উল্লেখযোগ্য কবি অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাতে। সেই সম্মেলনের স্মৃতি এখনো অনেকের মনে আছে।

সেই সম্মেলনের সাফল্যের ফলেই হয়তো, তারপর বহু স্থানে কবি-সম্মেলনের প্রচলন দেখা যায়। অন্যান্য বড় উৎসবের অঙ্গ হিসেবেও কবি-সম্মেলন যুক্ত হতে থাকে। এখন রবীন্দ্র সদন কর্তৃপক্ষ'ও আধুনিক কবিতা পাঠের আয়োজন করেন, এই তো সেদিন সাহিত্য আকাদেমির আঞ্চলিক শাখাও একটি কবি-সম্মেলনের ব্যবস্থা করলেন—রাজা রামমোহনের দু'শো জন্মবর্ষ উপলক্ষে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, কবি-সম্মেলনগুলিতে বেশ শ্রোতা হয়। কৃত্তিবাস পত্রিকার পক্ষ থেকে দু-তিন বছর যে বার্ষিক কবি-সম্মেলন হয়েছিল—তাতে রীতিমতন ভিড় হয়েছিল। অনেকের ধারণা, কবিতা পাঠ শুনতে আসে শুধু কবিরাই! কথাটা হয়তো ঠিক, মা ষষ্ঠীর কৃপায় কবির সংখ্যাও কম নয়—তবে কবিরা সাধারণত অপরের কবিতা শোনে না—একথাও ঠিক। কিছু কিছু রমণী শ্রোতা বা দর্শকও সাধারণ দৃশ্য।

দেখা যায়, কবি-সম্মেলনের প্রথম দিকটা যেমন জমজমাট থাকে—শেষের দিকটা সেরকম নয়—আস্তে আস্তে ভিড় ফাঁকা হয়ে যায়। শুধু বাড়ি ফেরার তাড়ার জন্যই এরকম হয় না—অনেকেই হলের বাইরে দাঁড়িয়ে গল্প করে। কেন এরকম হয়?

ধরে নেওয়া যাক, কবিতা শ্রবণ খুব উচ্চাঙ্গের ব্যাপার। সত্যিকারের কবিতাপ্রেমী, কবির স্বকণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি শুনতে হয়তো ভালোবাসেন। কিন্তু যে-কোনো ভালো জিনিস গ্রহণ করার একটা সীমা আছে। রসগোল্লা ভালোবাসা এক জিনিস আর পাঁচ কেজি রসগোল্লা এক সঙ্গে খেয়ে ফেলা আরেক ব্যাপার। স্নায়ু বিশেষজ্ঞদের মতে, পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিটের বেশী একটানা এই সব উপভোগ করা সম্ভব নয়। মিউজিয়াম বা আর্ট গ্যালারি যাঁরা এক দিনেই দেখে শেষ করতে চান—তাঁরা আসলে অনেক কিছুই দেখেন না, ক্লান্ত হয়ে যান। কবি-সম্মেলন এক ঘণ্টার বেশী টানা কোনোক্রমেই উচিত নয়।

কিন্তু উদ্যোক্তাদের মুশকিল, তাঁদের অনেককে অন্তর্ভুক্ত করতে হয় অনুষ্ঠানে। একে ডাকলে ওকে বাদ দেওয়া যায় না—এই রকমের একটা ব্যাপার আছে। কবিরা টাকা পান না, কিন্তু দারুণ অভিমানী। সত্তর-আশি জন কবির কবিতা একসঙ্গে বসে শোনা—এক বীভৎস অভিজ্ঞতা।

অনেক কবিরই প্রকাশ্যে কবিতা পড়ার অভিজ্ঞতা নেই। নিজের কবিতা শুধু আবেগভরে পড়ে যাওয়াই যথেষ্ট নয়—সেটা মানায় শুধুমাত্র মহাকবিদের—অন্যদের কবিতা সুশ্রাব্য হওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ, টি এস এলিয়ট, ডিলান টমাস, কার্ল স্যাণ্ডবার্গ—এঁদের আবৃত্তির রেকর্ড শুনলেই বোঝা যায়—কত যত্ন করে কবিতা পড়তে হয়।

কবিতা পাঠ্য কি শ্রাব্য—এই নিয়ে একটা তর্ক আছে। অনেকের মতে, কবিতা শুধু নিজের চোখে পাঠ করে উপভোগ করার জিনিস, কানে শুনে পুরোপুরি রস পাওয়া যেতে পারে না। এ সম্পর্কে এক-একজনের এক-এক রকম মত। কিন্তু, যিনি কবি-সম্মেলনে কবিতা পাঠ করতে উঠবেন—তিনি যদি পরিষ্কার ও শুদ্ধ উচ্চারণে, জোরালো গলায় তাঁর কবিতাটি শ্রোতার কাছে পৌঁছে দিতে না পারবেন—তিনি আসলে কবিতার ক্ষতিই করবেন। কবি-সম্মেলনে যোগদানকারী কবিদের আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে নেওয়ার প্রয়োজন আছে—শ্রোতাদের অযথা উৎপীড়ন করার কোনো মানে হয় না।

সম্প্রতি কালীচরণ ঘোষ লিখিত "জাগরণ ও বিস্ফোরণ" নামক গ্রন্থের দুটি খণ্ড পাঠ করার সৌভাগ্য হলো। যে শ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই সব গ্রন্থ রচিত হয়, তার দৃষ্টান্ত আজকাল ক্রমেই বিরল হয়ে হয়ে আসছে। এই লেখকেরই লেখা ইংরেজী বিরাট গ্রন্থ 'দা রোল অব অনার' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই জানেন যে আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস রচনায় ও গবেষণায় এঁর দান কতখানি। এবার তিনি বাংলায় আর একটি বিরাট গ্রন্থ লিখেছেন।

খবরের কাগজের শোক-সংবাদে আজকাল মাঝে মাঝেই দেখা যায় এক-একজনের মৃত্যুর খবর ; যিনি এক সময় প্রখ্যাত বিপ্লবী ছিলেন। কচিৎ তাঁদের ছবি ছাপা হয়, অনেক সময়েই হয় না। অধিকাংশ পাঠকের কাছেই ঐ-সব নাম অজানা, মনে কোনো রেখাপাত করে না, শোক-সংবাদেও তাঁদের জীবনকাহিনী থাকে যৎসামান্য। যে মানুষ এক সময় দেশের জন্য জীবন তুচ্ছ করেছিলেন কিংবা জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কাটিয়েছেন কারাগারের অন্ধকারে—দেশ স্বাধীন হবার পরও তাঁদের এমন অবহেলিত মৃত্যুর কথা চিন্তাও করা যায় না। অথচ এরকমই হচ্ছে। এ-কালের মানুষ দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না। ভারতীয়রা বোধ হয় এমনিতেই বড় ইতিহাস-বিস্মৃত জাতি। ইতিহাস-জ্ঞান যাদের নেই, তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাও থাকে না।

আমাদের দেশের দুঃখ-দুর্দশার কথাই এখন সব সময় বেশী করে বলা হয়। কিন্তু গর্ব করার মতন যে কয়েকটি বিষয় আছে, তা ছেলেমেয়েদের জানাবার ব্যবস্থা নেই। অসমসাহসী এবং আত্মত্যাগী

যেসব মানুষের জন্য আমাদের দেশের স্বাধীনতা সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলের কীর্তিকলাপ না জেনে ভবিষ্যৎ তৈরি হবে কী করে? তাঁদের সুকীর্তি এবং ব্যর্থতা—দুটোরই বোধ হয় জানার দরকার আছে।

দুঃখের বিষয়, গোটা স্বাধীনতার সংগ্রাম নিয়ে একটি কোনো নির্ভরযোগ্য বিস্তৃত তথ্যমূলক বই আজও লেখা হয়নি। বিভিন্ন অধ্যায়ের কাহিনী কিছু আছে বটে। আর আছে সরকার প্রকাশিত কিছু নীরস তথ্যপঞ্জী। সবচেয়ে পাঠযোগ্য অবশ্য, কয়েকজন প্রাক্তন বিপ্লবী বা রাজনৈতিক কর্মীর লেখা আত্মজীবনীগুলি। কিন্তু আত্মজীবনী আর ইতিহাস এক নয়। আত্মজীবনীগুলিতে যার-যার নিজস্ব দলের কথাই স্বাভাবিকভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। আর, ইতিহাস নামে যে কয়েকটি বই চলে, তার অধিকাংশই ন্যাকামি ও উচ্ছ্বাসে ভরা। বাঙালীদের রচনার আর একটি দোষ, তাঁদের লেখাগুলো পড়লে মনে হয়, বাংলা ছাড়া যেন আর কোথাও কিছু বৈপ্লবিক কাজকর্ম সংঘটিত হয়নি। বাঙালী স্বদেশীদের প্রাধান্য সত্ত্বেও সর্বভারতীয় চিত্রটি ফুটিয়ে তোলা বাঞ্ছনীয়।

কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের লেখা অকারণ উচ্ছ্বাসবর্জিত এবং তথ্যসম্মত। তাঁর কোনো লেখাতেই 'আমি'র অনুপ্রবেশ নেই, এটি একটি আশ্চর্য ঘটনা। রীতিমতন বার্ধক্যে পৌঁছেও তিনি অহমিকা-শূন্য হয়ে ইতিহাসগবেষণা করে যাচ্ছেন।

অবশ্য, কালীচরণ ঘোষের লেখাও সম্পূর্ণাঙ্গ নয়। যাঁরা সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমেই শুধু এ-দেশের মুক্তি আনতে চেয়েছিলেন, তিনি শুধু তাঁদেরই ইতিহাস রচনায় ব্রতী। গান্ধীজীর আগমনের পর এ-দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা যে আর-একটি পৃথক রূপ নেয়—তিনি সে বিষয়ে আগ্রহী নন। সেইজন্যই তাঁর বৃহদাকার রচনায় গান্ধীজীর উল্লেখ থাকে যৎসামান্য, নেহরু-প্যাটেল-আবুল কালাম আজাদদের নামও চোখে পড়ে না।

স্বাধীনতার পর গান্ধীজী এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকার কথাই অস্বীকার করে গেলেন। ক্ষমতায় আসবার পর কংগ্রেস বড় গলায় প্রচার করতে লাগলেন শুধু তাঁরাই এনেছেন দেশের স্বাধীনতা। সেই রকম সশস্ত্র বিপ্লবীরাও স্বাধীনতার আগে বা পরে গান্ধীবাদীদের সুনজরে দেখতে পারেননি—গান্ধীজীর ভূমিকাও তাঁরা স্বীকার করতে চান না। এর ফলে তাঁরা আরও বেশী সরকারী অনীহা অর্জন করেছেন। স্বাধীনতার পর পঁচিশ বছর লাগলো সংগ্রামীদের কোনো প্রকার স্বীকৃতি দেওয়ার কথা চিন্তা করতে।

সুতরাং, কালীচরণ ঘোষের বইখানি শুধু সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসের কথা মনে রেখেই পড়তে হবে। তাঁর প্রত্যেক বইতেই একটি পরিকল্পনা থাকে। পূর্বোক্ত ইংরেজী বইতে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁদেরই ওপরে, যাঁরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে প্রাণ দিয়েছেন।

এই বইতে তিনি মোটামুটি জোর দিয়েছেন বাংলা দেশের আন্দোলনের ওপরেই। প্রথম খণ্ডে বিদেশী ঔপনিবেশিকতার পটভূমি এবং জাতীয়তাবোধের উন্মেষের কথা লিখেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে বাংলা দেশের প্রতিটি ঘটনার বিবরণ। যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন কিংবা অন্তত তিন বছর কারাবাস করেছেন—তাঁদের একজনের কথাও তিনি বাদ দিতে চাননি। তাঁর মনে বোধ হয় এইটাই ছিল প্রধান চিন্তা—একজনের নামও যেন হারিয়ে না যায়। কত অজস্র ঘটনা, কত অকিঞ্চিৎকর ঘটনাতেও যে কত যুবকের পাঁচ বছর দশ বছর কারাদণ্ড হয়েছে—তা এই বই না পড়লে বিশ্বাস করা যায় না। সামান্য একটা ডাকাতির প্রস্তুতি বা গোপনে একটা আগ্নেয় অস্ত্র রাখা—এই জন্যই কঠোর দণ্ড, এমনকি কালাপানি পর্যন্ত। এত ছোট ছোট ঘটনা ইতিহাসবদ্ধ রাখা একটা অসম্ভব কথা। পড়তে পড়তে আমারও অনেক সময় মনে হয়েছে, কোথায়

কোন গ্রামে উনিশ শো তিরিশ-একতিরিশ সালে কয়েকজন যুবক স্বদেশী-ডাকাতি করতে গিয়ে সর্বমোট বাহান্ন টাকা পেয়েছিল, তার ফলেই তিন বছরের অধিক কারাদণ্ড—এই ঘটনাও কি এখন আমাদের জানার দরকার আছে? তখনই বুঝতে পারি গ্রন্থকারের অভিপ্রায়, একজনও যেন হারিয়ে না যায়! পাঠকের মনে এই প্রশ্নও জাগবে, এত সব ঘটনা তিনি পেলেন কোথা থেকে? বুঝতে অসুবিধে হবে না, দীর্ঘকাল ধরে পুলিশ রিপোর্ট ঘেঁটে ঘেঁটে এগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। কে তাঁকে এই কাজ করার জন্য মাথার দিব্য দিয়েছিল? একেই বলে সাধনা।

তাঁর গ্রন্থখানি মহামূল্যবান সন্দেহ নেই। তবু কয়েকটি প্রশ্ন আছে। তিনি এত বিরাট ক্যানভাস নিয়েছেন যে, সেইজন্য অনেক ঘটনাই অতি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। এত সংক্ষেপে এত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বর্ণনার ফলে (বিশেষত প্রথম খণ্ডে) অতি সরলীকরণের ভাব এসে গেছে। আর, যে সব ঘটনাগুলি বহুবিদিত, তাতে নতুন কোনো আলোকপাত আশা করেছিলাম। স্বাধীনতাসংগ্রামীদের ইতিহাস পড়তে পড়তে একালে আমাদের মনে অনেকগুলো খটকা জাগে। তার উত্তর কে দেবেন? কয়েকটি প্রশ্নের নমুনা রাখছি মাত্র। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় নেবার পরেও কিছুদিন বাংলার বিপ্লবীরা তাঁর খরচা চালাবার জন্য টাকা পাঠাতেন, তিনি ফিরে এসে আবার নেতৃত্ব দেবেন বলে, এ কথা কি ঠিক? তিনি ফিরে না আসায় বিপ্লবীরা কি হতাশ হয়েছিলেন? বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গে কি নরেন গোঁসাইয়ের ব্যক্তিগত বিরোধ ছিল। প্রীতিলতা আত্মহত্যা করলেন কেন? যাঁরা দু' দশ বছর জেল খেটেছেন, তাঁদের মধ্যে কতজন জেল থেকে ফিরে আবার রাজনৈতিক কর্ম করেছেন? আমরা কয়েকজনের কথা মাত্র জানি। কিন্তু যে সহস্র সহস্র যুবকের নাম আমরা এখানে পাই—দেশের প্রতি ভালোবাসা তাঁদের মধ্যে কতজন শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন?

অনেক দিন চাপা পড়েছিলেন বসুমতী সিরিজের হলদে মুড়মুড়ে কাগজের গ্রন্থাবলীতে, কিছুদিন ছিলেন অজ্ঞাতবাসে, তারপর হঠাৎ সম্প্রতি সোনার জলে নাম লেখা মলাটে, শক্ত বাঁধাইয়ে নতুন ত্রৈলোক্যনাথকে পেয়ে চমকিত খুশী হলাম। অনেক দিন আগে পড়েছিলাম, আবার আদ্যোপান্ত পড়া যায়। শুধু পড়া নয়, এই বই নিয়ে আমি কয়েক দিন পথে পথে ঘুরেছি, ট্রামে-বাসে একটু বসার জায়গা পেলেই বই খুলে বসেছি এবং সকালে ঘুম থেকে উঠেই, দুপুরে খাবার সময়েও ত্রৈলোক্যনাথকে ছাড়া যায় না।

ত্রৈলোক্যনাথের নাম যতজন শুনেছে, ততজন তাঁর বই পড়েনি। অল্প বয়েসী অনেক পাঠককে প্রশ্ন করেই আমি এ-কথা জানতে পারি। বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত সমালোচকরা ত্রৈলোক্যনাথের প্রতি তেমন সুবিচার করেননি। তাঁর প্রাপ্য তাঁকে দেওয়া হয়নি। বস্তুত, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতন বিচিত্র রসের লেখক আমাদের বাংলা ভাষায় আর দ্বিতীয়টি নেই। তাঁকে ঠিক হাসির গল্প বা ব্যঙ্গ-সাহিত্যের স্রষ্টা বললেও কিছুই বোঝা যায় না। এ রকম উদ্দাম কল্পনাশক্তি, কিংবা বলা যায় এরকম নির্লজ্জ কল্পনার প্রকাশ আর কোথায় দেখেছি? স্পষ্টই বোঝা যায়, এঁর কোনো গল্পই আগে থেকে চিন্তা করে লেখা নয়, মাথায় যা আসছে লিখে যাচ্ছেন, এবং কী একখানা মাথা!

ত্রৈলোক্যনাথের জন্ম ১৮৪৭-এ, এবং বেঁচেছিলেন ১৯১৯ সাল পর্যন্ত। লিখতে শুরু করেছেন বেশ বেশী বয়সে, এবং রচনাগুলির ভঙ্গিও এক মজলিসী বুড়োর গাল-গল্পের মতন। কিন্তু যে

ত্রৈলোক্যনাথ সারা জীবন ছিলেন আদর্শবাদী, দেশ প্রেমিক, একরোখা এবং অনেক রকম শিল্পবিজ্ঞানে আগ্রহী, তিনি গল্প লেখার সময় যত রাজ্যের উদ্ভট জিনিসের কথাই চিন্তা করতেন কী করে! বস্তুত, তাঁর প্রায় সব কটি লেখাতেই অদ্ভুত বা উদ্ভট রসের উপদ্রব এবং সেই জন্যই তাঁর লেখা সকলের থেকে আলাদা হয়ে গৌরবের আসন পেয়েছে।

ত্রৈলোক্যনাথ যখন লিখেছেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর যা-কিছু দেওয়ার দিয়ে গেছেন, রবীন্দ্রনাথ পেয়ে গেছেন নোবেল প্রাইজ। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের লেখা পড়লে মনেই হয় না, বাংলা ভাষায় ঐ দুজন লেখক জন্মেছেন। তাঁর ভাষায় বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই—এ এক অনর্গল গল্প বলার ভাষা, কোথাও আটকায় না, কোথাও ভাষার তারিফ করার জন্যও থামতে হয় না—এবং অনায়াস সরলতাই এই ভাষার সবচেয়ে বড় গুণ।

আমরা অনেক রকম ভূতের গল্প পড়েছি, কিন্তু টেলিগ্রাফ করে করে কোনো মানুষকে বিলেতে পাঠাবার কথা কখনো শুনবো বলেও কল্পনা করেছি কি? এবং ভূতকে শায়েস্তা করা যায় গাঁজা খাইয়ে? এবং সেই ভূতের আবার কাগজের সম্পাদক হবার দারুণ যোগ্যতা। ডমরুধরের গল্পাবলীর বৈশিষ্ট্য এই যে, নায়ক ডমরুধর নিজে একটি অতি পাজি, জোচ্চোর এবং পাষণ্ড—কিন্তু অবলীলাক্রমে এবং দাপটের সঙ্গে সে নিজের কুকীর্তিগুলি বলে যাচ্ছে, কোনো গ্লানি নেই। ত্রৈলোক্যনাথ বিশেষ কোনো মন্তব্য করা পছন্দ করেন না। হিন্দু বামুন ধর্ম-রক্ষার শুচিবাইতে অল্প বয়সী বিধবা কন্যাকে একাদশীর দিন জল পর্যন্ত পান করতে দেয় না, তৃষ্ণায় মেয়েটি ঘরের মেঝে চাটতে চাটতে মারা যায়। এ ঘটনা কত নির্লিপ্ত ভাবে বলেছেন। তবু সর্বক্ষণ বোঝা যায়, একজন বুদ্ধিমান, সংস্কারমুক্ত লেখক এই সমাজের গোঁড়ামি, ধর্মীয় পাগলামির প্রতি ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসছেন।

গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন যে, ত্রৈলোক্যনাথের জনপ্রিয়তা হ্রাসের অনেকটা কারণ শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। এবং এটা হচ্ছে "অশ্রুর নিকটে হাসির পরাজয়, ভাবালুতার আবেদনের নিকট বুদ্ধির পরাজয়। ইহা স্বাভাবিক হইলেও যুগলক্ষণাক্রান্ত ঘটনা।" হয়তো এটাই সত্যি। ত্রৈলোক্যনাথের মতন এমন একজন লেখকের যোগ্য সমাদর না-হওয়া একটি সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুঃখের ঘটনা। জীবিতকালেও ত্রৈলোক্যনাথ খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন কি না আমার জানা নেই।

তবে, বাংলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথের ধারাটি একেবারে লুপ্ত হয়নি, তা শাখা-প্রশাখায় জড়িয়ে গেছে—কখনো রাজশেখর বসুতে, কখনো প্রমথনাথ বিশীর মধ্যে। এবং পরবর্তীকালে সৈয়দ মুজতবা আলী এবং কিছুটা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যেও এর রেশ খুঁজে পাওয়া যায়।

আমাদের এই ভারতবর্ষের প্রায় তিন দিকে সমুদ্র, উত্তরে নগাধিরাজ হিমালয়, বিহার-উড়িষ্যা-তরাইয়ের জঙ্গল, তা ছাড়া ভুবন প্রসিদ্ধ সুন্দরবন। আমাদের দেশেই আছে মরুভূমি, নদী অসংখ্য, সোনা ও হীরের খনিও রয়েছে—কয়লা খনির কথা বাদই দিলাম। অদূরেই আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, তার কোনো অঞ্চলে এখনো এমন আদিবাসী আছে, যাদের তুলনা পৃথিবীতে বিরল। মিনিকয়, লাক্ষাদ্বীপ ইত্যাদি বিষয়ে তো আমরা কিছুই জানি না।

মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে, এ-দেশে এত প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য থাকলেও আমাদের সাহিত্যে তার প্রতিফলন দেখা যায় না কেন? আমাদের সাহিত্য প্রায় সবটাই নগরকেন্দ্রিক, এ ছাড়া গ্রাম সম্পর্কে স্মৃতি-রোমন্থন জাতীয় রচনাও কিছু আছে। তার বাইরে এই যে বিশাল ভারতবর্ষ, সে-সম্পর্কে রচনা এত বিরল কেন?

এক সময় সাহিত্যের "ভূগোল বাড়ানোর" একটা হুজুগ উঠেছিল। কল্লোল যুগে যেমন রবীন্দ্রনাথের রচনায় কী কী নেই, সেইসব বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচনার ঝোঁক এসেছিল খুব। যেমন বস্তী বা কয়লাখনি বা আলো নেবানোর পর স্বামী-স্ত্রীর শয়নকক্ষ। কিন্তু হুজুগ বা ঝোঁকের মাথায় সাহিত্য রচনা সার্থক হয় না। বস্তুত পটভূমিকার ওপরে সাহিত্যের সার্থকতা নির্ভর করে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক—এইটাই চিরকালের সাহিত্যের বিষয়। সেই মানুষও, কোনো গোষ্ঠী বা সমাজকে সমগ্রভাবে দেখা নয়, আলাদা মানুষ, অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষই যেমন আলাদা, তাদের সম্পর্ক নির্ণয়ই সাহিত্যের ভিত্তি। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মা নদীর

মাঝি” উপন্যাসটিতে পদ্মা নদীর দৃশ্য বা ওখানকার মাঝিদের জীবনযাত্রার সমস্যা মুখ্য নয়। পদ্মাপারের কয়েকজন নারী-পুরুষ জীবিকায় যারা মাঝি, তাদের হৃদয়ের সম্পর্কের কথাই উপন্যাসটির বিষয়।

তবু পটভূমির বৈচিত্র্যে একটা আলাদা স্বাদ যে আসে, সে-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাহলে আমাদের এই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি সাহিত্যিকদের অনীহা কেন?

প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছিলাম একজন বর্ষীয়ান্ লেখকের কাছে। তিনি এ পর্যন্ত প্রায় ষাটখানা গল্প-উপন্যাসের বই লিখেছেন, নিজে অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন, কিন্তু তাঁর সব লেখাই শহর ও শহরতলী নিয়ে, একটা উপন্যাসে বোধ হয় দার্জিলিং-এর কথা আছে আর একটাতে পুরী।

তিনি আমার প্রশ্ন শুনে বললেন, এর কারণ অনেকগুলো। ভেবে ভেবে বলা যাক। প্রথম কারণই ধরো, রবীন্দ্রনাথ।

আমি বললাম, রবীন্দ্রনাথ?

উনি বললেন, হ্যাঁ। রবীন্দ্রনাথ সারা পৃথিবী বেশ কয়েকবার ঘুরেছেন। দেখেছেন কত বিচিত্র প্রকৃতির দৃশ্য। কিন্তু তাঁর সারা জীবনের এত লেখার মধ্যে শুধু জুড়ে আছে বাংলা দেশ (অখণ্ড বাংলা দেশ)—শুধু বাংলা দেশের কথাই লিখেছেন। বিদেশের বর্ণনা আছে? চিঠিপত্রের কথা ছেড়ে দাও—তাও বিশেষ নেই। এমনকি মাঝ সমুদ্রের ওপর হাসানামারু জাহাজে বসে কবিতা লিখছেন, সেখানেও বাংলা দেশের বর্ষার কথাই তাঁর মনে পড়ছে।

—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলা দেশ নিয়ে লিখেছেন ব'লে, আর কেউ অন্য জায়গা নিয়ে লিখবে না, তার কোনো মানে আছে?

—হ্যাঁ, আছে। রবীন্দ্রনাথ একটা ট্র্যাডিশান তৈরি করে দিয়ে গেছেন। ট্র্যাডিশান বহির্ভূত সাহিত্য হয় না। ছাখো না

শরৎচন্দ্রও তো বর্মা মুল্লুকে অনেকদিন ছিলেন। পথের দাবিতে খানিকটা ছাড়া—আর কোথাও বর্মা মুল্লুকের কথা তাঁর সাহিত্যে বিশেষ এসেছে? অন্যান্য লেখকেরাও সেই ট্র্যাডিশান মেনে চলেন।

এ ছাড়া, আর কী কী কারণ থাকতে পারে বলুন।

—আর একটা প্রশ্ন আছে আইডেন্টিফিকেশনের। গল্প-উপন্যাস পড়তে পড়তে পাঠক সবসময় নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। এ-রকম ঘটনা আমার জীবনে হলেও হতে পারতো—এ-রকম একটা ভাব জাগে। কিন্তু অচেনা পরিবেশ বিচিত্র মানুষের মধ্যে উপস্থিত করলে, পাঠকেব সে-রকম কল্পনা করতে অসুবিধে হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীই আমাদের দেশের সাহিত্যের পাঠক। তারা আর কীই বা দেখেছে বলো? তারা বড়জোর জীবনে এক-আধবার যায় কোনো হিল স্টেশনে বা সমুদ্রের ধারে, আর নয়তো তীর্থ দর্শনে। এই জন্যই দেখবে, তীর্থস্থান নিয়ে বাংলায় অনেকগুলো লেখা আছে।

তারপর ধরো, আমাদের লেখকেরাও তো আসে নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। তারা নিজেরাই কি ওসব জায়গায় গেছে? নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া কি লেখা যায়? ইচ্ছে ক'রে, পথ খরচ জোগাড় ক'রে কেউ হয়তো যেতে পারে—কিন্তু সত্যি কথা কী জানো, সব সাহিত্য রচনারই উৎস বাল্যস্মৃতি। আমার কথাই ধরো না। আমি লণ্ডন শহরে দুবার গেছি। অথচ সেখানকার অনেক পথ-ঘাট আমার মনে নেই। কিন্তু পূর্ববঙ্গের যে গ্রামে আমি ছেলেবেলাটা কাটিয়েছি, যে-গ্রাম গত পঁচিশ বছরের মধ্যে আমি আর দেখিনি—সেখানকার পথ-ঘাট এখনো জলজল করে আমার চোখে ভাসে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও অনেক গলদ আছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের মধ্যে কোনো সাহিত্য বোধ জন্মাবার

ব্যাপারে সাহায্য করে না। বড় বড় অফিসাররা পাতার পর পাতা অফিসিয়াল চিঠি লিখতে জানে, কিন্তু নিজের মনের কথা বা কোনো অভিজ্ঞতার কথা গুছিয়ে লিখতে জানে না। আমাদের সেনাবাহিনীতে কোনো বাঙালী কি নেই? তাদের মধ্যেও কেউ যুদ্ধ বা ব্যারাকের অভিজ্ঞতা নিয়ে কি লিখতে পারতো না কিছু? অনেক দিন আগে বরেন বোস লিখেছিল একটা—তারপর তো আর দেখলাম না। একবার বিদেশে যাবার সময় একটা ইটালিয়ান জাহাজে একজন বাঙালী ডাক্তার দেখেছিল্যম। ভদ্রলোক সারা জীবন জাহাজে জাহাজে ঘুরেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভদ্রলোক বাংলা একেবারে ভুলে গেছেন বা জানেন না। কল্পনা করতে পারো কোনো ইংরেজের বাচ্চা ইংরিজী ভুলে গেছে?

দূরের কথা না হয় গেল, কাছাকাছিই তো সুন্দরবন, তরাইয়ের জঙ্গল বা পাহাড়ী এলাকা আছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে জঙ্গল বা পাহাড়ের সত্যিকারের উপস্থিতি নেই বললেই চলে—নদী আছে, তাও সামান্য। খোলা আকাশ বা বিশাল বৃষ্টির দৃশ্যও আজকাল বেশী চোখে পড়ে না। কবিতায় প্রকৃতি-বর্ণনা এখন অ্যাবস্ট্রাক্ট। অর্থাৎ শুধু অরণ্য বা শুধু পাহাড় বললেই যথেষ্ট—কবিতার মধ্যে বিশেষ স্থানের বর্ণনা অপ্রয়োজনীয়। আর গল্প-উপন্যাসে কেরানী বা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার নায়ক—তারা শুধু সিনেমা দেখে বা গঙ্গার ধারে বেড়ায় বা ছুটিতে দার্জিলিং-এ যায়। তারপর এখন তো আবার হুজুগ উঠেছে—একালের তারুণ্য নিয়ে লিখতে হবে। তার মানে তো কফি হাউস, রক, ট্রাম-বাস আর রাস্তার লড়াই। পুরিধি বাড়বার বদলে আরও ছোট হয়ে আসছে, তাই না।

তুমি তো বললে শুধু প্রকৃতির কথা। কৃষক বা শ্রমিকদের নিয়েও আজকাল কেউ লেখে না কেন? কোনোদিনই অবশ্য সেরকম ভাবে লেখা হয়নি। তবে এক সময় তবু শৌখিন সহানুভূতি

দেখিয়ে কিছু লেখা হতো, আজকাল তা-ও হয় না। কেন হয় না জানো? কৃষক বা শ্রমিকরা সাহিত্য পড়ে না বলে। কেউ ওদের পড়াবার চেষ্টাও করলো না। রাশিয়ার মজুরদেরও বই পড়ার নেশা আছে (বিপ্লবের আগে থেকেই)—এখানে যদি তার ছিটেফোঁটাও থাকতো, এখানকার লেখকরা ঠিকই লিখতো ওদের নিয়ে। অন্য কারুকে উপদেশ দিতে হতো না। সাহিত্যিক শুধু নিজের জন্য লেখে না। পাঠকের প্রতিক্রিয়া তাকে ভাবতেই হয়। বুঝলে?

সমুদ্র তীরে বালির ওপরে পড়ে ছিল একটি যুবতীর দেহ, মৃত এবং সম্পূর্ণ নগ্ন।

উপন্যাসটির শুরু এই দৃশ্য থেকে। কয়েকটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে প্রথম সেই মৃতদেহটি দেখতে পায়। স্পেনের সমুদ্র উপকূল, কয়েকটি ধনী পরিবারের নিজস্ব এলাকা, বাইরের লোকের প্রবেশ নিষেধ। মেয়েটির মৃতদেহ সমুদ্র দিয়ে ভেসে এসেছে, কিন্তু অবিকৃত।

স্প্যানীশ উপন্যাসটির ইংরেজী অনুবাদের নাম 'সামার স্টর্ম,' লেখক হুয়ান গারথিয়া হরতেলানো। গ্রন্থকারের বয়েস ৪০, নাট্যকার হিসেবেই পরিচিত, তাঁর দুখানি উপন্যাস সমালোচকদের কাছ থেকে পুরস্কৃত হয়েছে। এই উপন্যাসটিকে আধুনিক স্প্যানীশ উপন্যাসের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা যায়।

উপন্যাসটি যে-ধারায় রচিত, সেই ধারাটি আজকাল বিরল হয়ে এসেছে। সংবাদপত্রের বহু বিস্তারের ফলে সাংবাদিক গদ্যই পাঠকদের কাছে বেশী পরিচিত, এবং গল্প-উপন্যাসে সেই গদ্যই চলেছে। এই গদ্য লঘু এবং ক্ষিপ্র, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যেতে একটুও সময়ক্ষেপ করে না। আজকালকার ইংরেজি বাংলা উপন্যাসে এই গদ্যই প্রধান। এই সাংবাদিক গদ্য ভালো কি খারাপ সে কথা জোর দিয়ে বলা যায় না, নিছক খারাপ বলে উড়িয়ে দিলেও অবশ্য ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে যাওয়া হবে।

আলোচ্য উপন্যাসটির ভাষা মৃদু ও মন্থর, কোথাও ব্যস্ততা নেই। ফলে, এতে বর্ণিত অবসন্ন চেতনার কথা বেশ নিবিড়ভাবে অনুভব করা যায়। একজন লোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের পাড়ে যাচ্ছে একা। যাবার পথে কিছুই ঘটলো না, শুধু সে অলস পায়ে

হেঁটে গেল, তবু এই পথটুকুর দু'ধারের দৃশ্য ও বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা অনেক লেখকের কাছে অপ্রয়োজনীয়, এই লেখকের কাছে নয়। সমস্ত পাত্রপাত্রীর পোশাকের বর্ণনা, চেয়ারে কে কী-রকম ভাবে বসে আছে, কার হাতে কখন ঠিক কোন পানীয়—এসব উল্লেখ করতে লেখক কখনো ভোলেননি। ফলে, মন্থর অর্থহীন জীবনের ছবি খুব চমৎকার ফুটে উঠেছে। সমুদ্রের পাড়ে নগ্ন মৃত যুবতীর দেহ আবিষ্কার দিয়ে যে উপন্যাসের শুরু, সেটাকে ডিটেকটিভ উপন্যাসের মতন হুড়হুড়িয়ে লেখার লোভ অনেকেই সামলাতে পারতেন না।

কয়েকটি অর্থবান অভিজাত পরিবার সমুদ্রতীরে গ্রীষ্মাবাস বানিয়েছে—শহর ছেড়ে নিরালায় গ্রীষ্ম কাটাবার জন্য। সকালে বিকেলে সমুদ্রে সাঁতার, এক-এক সন্ধ্যেবেলা এক-একজনের বাড়িতে পার্টি, হ্রস্ব বেশবাস পরে বাগানের চেয়ারে বসে রোদ পোহানো—এ ছাড়া আর কিছুই করার নেই। সকলেরই ব্যবহার ভদ্র ও ফর্মাল। এদের পুরুষরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আহূত হয়েছিল, তখন লড়াই করেছে নোংরায় কাদায়, মেরেছে ও মরেছে, দেখেছে নরক, ব্যারাকের বেশ্যাপল্লীতে মুখ গুঁজে পড়ে থেকেছে—সে-সব ভুলে এখন আবার ফিরে এসেছে ভদ্র, অভিজাত জীবনে—এখন তারা প্রতি পদক্ষেপে কেতাদুরস্ত, ছেলেমেয়েদের শেখাচ্ছে যোগ্য সহবৎ। ওদের স্ত্রীরা চুলের ঔজ্জ্বল্য ও পায়ের আকৃতি ঠিক রাখার জন্য অতি পরিশ্রমী, পরনিন্দার মধ্যেও ঔদার্যের ভান। স্প্যানীশ উপন্যাসের মধ্যে সাধারণত যে দারিদ্র্য, ষাঁড়ের লড়াই, খুনোখুনি কিংবা জিপসী নাচ দেখবো বলে আমরা আশা করি—এ উপন্যাসে তার কিছুই নেই। দারিদ্র্য আছে বটে দূরের জেলে পাড়ায়—কিন্তু তা অনেক দূরে। এখানে সমুদ্রের পাড়ে এই ধনী পরিবারগুলির জীবন আপাত নিস্তরঙ্গ, এখানে প্রাচুর্য ও বিলাসিতা ও আলস্যের একঘেয়েমি। কিছুদিন ধরেই আকাশে মেঘ করে গুমোট হয়ে আছে, হঠাৎ কখন গ্রীষ্মের ঝড় উঠবে। এদের কথাবার্তায়

অব্যবহারিকভাবে আসবে আবহাওয়া প্রসঙ্গ, কবে ঝড় আসবে, এবারের ঝড়ে নাকি সমস্ত ইওরোপ তছনছ করে দেবে।

এর মাঝখানে ঐ নগ্ন যুবতীটির মৃতদেহ এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। মেয়েটির শরীরে পোশাক নেই, আশেপাশে কোথাও তার পোশাকের চিহ্ন নেই। তিরিশের নিচে বয়েস, সুঠাম স্বাস্থ্য, চামড়ার মসৃণ উজ্জ্বলতা দেখে মনে হয় সে স্প্যানীশ নয়, বিদেশিনী, সম্ভবত ইংরেজ মেয়ে। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা প্রথম তাকে দেখতে পায়।

সাধারণ মধ্যবিত্ত লোক হলে তাদের মধ্যে এ-নিয়ে মহা উত্তেজনার সঞ্চার হতো। অবিশ্রান্ত ঔৎসুক্য, গুজব আর গল্প ছড়াতো। কিন্তু অভিজাতরা কোনো ব্যাপারেই সহজে বিচলিত হয় না। একটি মেয়ের মৃতদেহ পাওয়া গেছে—এ নিয়ে পুলিশ মাথা ঘামাবে, তারা মাথা ঘামাবে না। তাদের জীবন পূর্ববৎ চলতে লাগলো, সেই রোদ পোহানো আর সাঁতার, জিন কিংবা হুইস্কির গ্লাস নিয়ে বারান্দায় বসা। পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তায় মেয়েটির প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্তভাবে দু' একবার ওঠে, কেউই বেশী কৌতূহল দেখায় না, প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়।

প্রথম পরিবর্তন দেখা দিল বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের মধ্যে। তারা আগে সাবলীল আনন্দে ছুটোছুটি করে খেলতো, এখন তারা নিজেদের মধ্যে ফিস'ফস করে কথা বলে। ফিসফিসানি মানেই অপরাধ বোধ। বাবা মায়েরা জেরা করে আড়ি পেতে সন্তানদের আলোচনা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়। আট-ন' বছরের ছেলেমেয়ে, তারা ঐ প্রথম একটি সম্পূর্ণ নগ্ন নারী মূর্তি দেখেছে। তারা নারী-শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করছে। একজন প্রশ্ন করে, হ্বাভিয়ের কাকা, ন্যাংটো অবস্থায় কেউ মারা গেলে সে স্বর্গে যায় ?

সেই অভিজাতবৃন্দের মধ্যে একমাত্র ডন হ্বাভিয়ের-ই বিচলিত হয়েছেন। তিনি এ-কাহিনীর উত্তম পুরুষ। ডন হ্বাভিয়ের বলশালী চেহারার প্রায়-প্রৌঢ়। সার্থক জীবন, ব্যবসায়ে উন্নতি করেছেন, তিনিই সমুদ্র-উপকূলের এই গ্রীষ্মাবাসের নির্মাণকারক।

তাঁর স্ত্রী ভোরা প্রথাগত সুন্দরী, দুটি ফুটফুটে সন্তান—আদর্শ পরিবার, অনেকেই ডন হ্বাভিয়ের-এর সুখী দাম্পত্য জীবনকে ঈর্ষা করে। কিন্তু সেই নগ্ন যুবতীর মৃতদেহ ডন হ্বাভিয়ের-এর মধ্যে একটা বিষাদময় অস্বস্তির সৃষ্টি করলো। তিনি বারবার মেয়েটির মুখ দেখতে যান, শুধু মুখ—সেখানে একটা পবিত্র অভিমান লেগে আছে। হ্বাভিয়ের মেয়েটিকে চেনেন না, কখনো দেখেননি। এক মুখ অন্য মুখের কথা মনে পড়ায়—কিন্তু হ্বাভিয়ের সে-রকম কোনো বাল্য স্মৃতি কিংবা ব্যর্থ প্রণয়ের চিন্তায় ডুবলেন না। তাঁর মধ্যে একটা যুক্তিহীনতা ও ছটফটানি দেখা দিল। বাইরে সেই দায়িত্ববান স্বামী ও পিতা হিসেবে রয়ে গেলেও ভিতরে তাঁর আত্মা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এই ফাঁপা অর্থহীন জীবনের সব অসারতা নিজে টের পেয়ে গেলেন। বিনা দ্বিধায় ও বিনা পরিকল্পনায় তিনি বন্ধু পত্নীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। আবার একই সঙ্গে, একই সময়ে একটু দূরের শহরে এক নষ্ট মেয়েমানুষের সঙ্গে শারীরিক সংসর্গ উপভোগ করতে লাগলেন। বস্তুত এই দুটি সম্পর্কের মূলেই কোনো যৌন আবেগের বাড়াবাড়ি নেই, ডন হ্বাভিয়ের রাতারাতি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়লেন না, আসলে তিনি নিজের ছটফটানির ব্যাখ্যা খোঁজার জন্য নিজেকে হারাতে ও ভাঙতে চাইলেন! কিন্তু তাও অত সহজ নয়। শেষ পর্যন্ত কিছু হলো না—জীবন আবার যথানিয়মে চলতে লাগলো।

যাঁরা বিশ্বাস করেন উপন্যাসে একটা উত্তরণ থাকা দরকার, শেষ পর্যন্ত কোথাও একটা লক্ষ্যে পৌঁছানো উচিত—তাঁদের হয়তো এ-উপন্যাস ভালো লাগবে না। কিন্তু এই জীবনযাপনের অবিশ্বাস ও অস্বস্তি এবং কয়েকটি আনুষঙ্গিক উপলব্ধি অত্যন্ত সার্থক ভাবে ফুটেছে। হ্বাভিয়ের তাঁর ধারাবাহিক জীবন থেকে বিচ্যুত হননি, সাধারণত কেউ তা হয়ও না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে নষ্টনীড় হয়ে গেছে। আমার উপন্যাসটি ভালো লেগেছে।

হাওড়া ব্রিজের নিচে বসে আছে দুটি ছেলে কিংবা সদ্য যুবক। একজন যুবকের কাঁধে একটি কাপড়ের ব্যাগ ঝোলানো। অপর যুবকটির মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। গঙ্গায় ময়লা জলের স্রোত।

প্রথম যুবক দ্বিতীয় যুবকের দিকে হাত বাড়িয়ে বললো, দে, তোর সিগারেটটা একটু দে।

দ্বিতীয় যুবক বেশ জোরে একটি সুখটান দিয়ে বললো, নে। এইটাই লাস্ট সিগারেট। তুই কাল রাত্তিরে কিছু লিখেছিস?

প্রথম যুবক চুম্বকের মতন সিগারেটের টুকরোটি মুখে আটকে রাখে। তারপর বলে, কাল একটা গল্প শেষ করেছি।

দ্বিতীয় যুবক: শোনাবি?

প্রথম যুবক (উদাসীন): কী হবে শুনিয়ে?

—তুই এত ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছিস কেন বল তো? তোর 'দক্ষিণে একা' গল্পটা তো সবাই দারুণ বলেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর এত ভালো গল্প—

—সবাই মানে কে কে? কোনো শালা তো ছাপার অক্ষরে কিছু মুখ খোলে না। কী করে বুঝবো লোকের ভালো লেগেছে?

—কেন, ব্যাঁটরা সাহিত্য সম্মেলনে ধনঞ্জয়দা তোর গল্পের কথা উল্লেখ করেননি?

—ও, ব্যাঁটরা সম্মেলন! ওতে তো মোটে সাতাশি জন লোক এসেছিল। ওখানে কে কী বললো, তাতে কী আসে যায়?

—তুই বলতে চাস, এর কোনো মূল্য নেই? তুই কি শুধু

এস্টাব্লিশমেন্টের চাকর যে-সব কাগজ দিন-রাত হুকা হুয়া করে, সেখানে প্রশংসা বেরুলেই—

—তুই কি ভাবছিস, আমি কোনোদিন এস্টাব্লিশমেন্টের পরোয়া করেছি ?

—তা বলছি না। তবে প্রদীপ্ত বলছিল কিনা তুই অমুক কাগজে একটা গল্প পাঠিয়েছিস—

—মোটেই না। প্রদীপ্তকেই বরং দেখছিলাম অমুকদার বাড়িতে গিয়ে খুব আমড়াগাছি করতে—

—অমুকদার বাড়িতে যাওয়াই কোনো দোষের ব্যাপার নয়।

—তুই-ও যাস বুঝি ?

—তুই আমাকে এই কথা বললি ?

—আমি বলছি না। লোকে বলছে।

—কে বলছে ! তুই একজনের নাম কর !

—আমি মোটেই নাম করতে চাই না। তুই-ই প্রদীপ্তর কথা বললি কিনা—

—প্রদীপ্ত শালা একটা দালাল—

—কোনো সন্দেহ নেই। চলি রে, আমাকে আবার টিউশানিতে যেতে হবে।

—আজ টিউশানি কাট মার।

—কালকেও যাইনি।

—রোজ যেতে হবে, এরই বা কী মানে আছে ?

—কোনো মানে নেই। কিন্তু যদি মাইনে কাটে—

—তোর তো ছাত্র নয়, ছাত্রী। সেইজন্যই তোর বেশী বেশী টান !

—আমার ছাত্রীকে যদি তুই একবার দেখতিস তা হলে আর এ-কথা বলতিস না !

—দেখতে যা-ই হোক, তবু তো একটা মেয়ে। আমি তো লাস্ট টু উইক্‌স কোনো মেয়ের সঙ্গে কথাই বলিনি।

—কেন, অমুতোষের বোন ?

—কাল কলেজ স্ট্রিটে দেখা হলো, চিনতেই পারলো না।

—কলেজ স্ট্রিটে কী করতে এসেছিল ?

—কী জানি। দেখলুম তো কফি হাউসে উঠে গেল একটা অচেনা ছোকরার সঙ্গে।

—তুই কফি হাউসে যাসনি ?

—কী করে যাবো ? পরশু দু'কাপ কফি খেয়ে পয়সা না দিয়ে উঠে এসেছি। দীপঙ্কর দাম দেবে বলেছিল, কোথায় যে কেটে পড়লো। তা ছাড়া, ইসমাইলের কাছে তিন প্যাকেট সিগারেটের ধার—

—অমুতোষের বোনের বড্ড কাঁট। ওর কাছে দয়া চাওয়া যায় না। ওকে হুকুম করতে ইচ্ছে করে—যদিও শুনবে না।

—ভুরু দুটো কিন্তু সাঙ্ঘাতিক। হোল ওয়ার্ল্ড খুঁজে তুই এরকম দুটো ভুরু দেখতে পাবি না।

—ওসব চিন্তা করে লাভ নেই। ওরা আমাদের জন্য নয়। চল, উঠি, আমার দেরি হয় গেল। তুই আমাকে দশটা নয়া দিবি ?

—আমি তা হলে কিসে যাবো ? সিগারেটও নেই। তার চেয়ে চল্, দুটো সিগারেট কিনি।

—আমার গল্পটা নিয়ে কী করবো ভাবছি।

—তুই যদি অলরেডি অমুক কাগজে পাঠিয়ে দিয়ে না থাকিস্—

—কোনো দিন পাঠাবো না। যতদিন না আমার নামে চিঠি আসে।

—আমাকে তো কবিতা দেবার জন্য চিঠি দিয়েছিল, তবু আমি পাঠাইনি।

—ঠিক আছে। আয়, আমরা একটা নতুন কাগজ বার করি।

—করবি ? প্রদীপ্ত বলছিল—

—প্রদীপ্তকে বাদ দে। ও তো এস্টাব্লিশমেন্টের দালাল। তুই আর আমি—

—অনুতোষকে সঙ্গে নিলে তোর কোনো আপত্তি আছে?

—ধ্যাস্। অনুতোষ লিখতে জানে? এখনো বাংলা বানানই শেখেনি।

—তবু একটু দেখে-টেখে দিলে যদি হয়। ও অনেক গ্রাহক জোগাড় করে দিতে পারবে।

—ঠিক আছে। অনুতোষকে নিতে পারি। কিন্তু দীপঙ্করের কোনো লেখা নেওয়া চলবে না— আমি সোজাসুজি বলে দিলাম। ও 'হসন্ত্' পত্রিকায় আমাকে গালাগাল দিয়েছিল।

—দীপঙ্করকে নেবার কোনো কোশ্চেনই ওঠে না।

—তা হলে কে কে সম্পাদক হবে?

বাকি সন্ধেটা একটি পত্রিকা প্রকাশের স্বপ্নে চমৎকার কেটে যায়। তারপর ওরা দু'জন হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির দিকে যায়। ওদের হাতের সিগারেটের আগুন কালপুরুষের চেয়েও বেশী জ্বলজ্বল করে।

কলকাতা থেকে বেশ কিছু দূরে কোনো গ্রামে বা কোনো মফস্বল শহরে বসে এক ব্যক্তি একটা উপন্যাস লিখছেন। তিনি লিখছেন অতি নিবিষ্ট ভাবে, তাঁর জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা নিঙড়ে এবং স্বপ্ন মিশিয়ে। মাঝে মাঝে দু' একজন সহকর্মী বা বন্ধুকে অংশ-বিশেষ পড়ে শোনান, তাঁরা ভালো বলেন। উপন্যাস কত বড় লিখতে হয় বা কোথায় থেমে পড়া সুবিধেজনক, তা তিনি জানেন না। তিনি লিখছেন, ঠিক যতখানি লেখা তাঁর মতে উপযোগী। তারপর একদিন সেটা সম্পূর্ণ হলো। ধরা যাক, প্রায় দু'তিন বছর লেগে গেল। তিনি সেটাকে সুন্দর হস্তাক্ষরে কপি করলেন, সযত্নে একটি ফাইলে বেঁধে রাখলেন। এরপর ছাপার প্রশ্ন।

কোথায় ছাপাবেন : এই লেখকটির যদি জগৎসংসার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা খুব কম থাকে তা হলে তিনি সরলভাবে সেটিকে রেজেস্ট্রি ডাকে কোনো একটি বড় পত্রিকার দপ্তরে পাঠাবেন। এর পর মাসের পর মাস কেটে যাবে। কোনো সাড়া শব্দ নেই। তিনি চিঠির পর চিঠি লিখবেন। উত্তর পাবেন না। তিনি আঘাত পাবেন। নিজের সৃষ্টির জন্য তাঁর বুক টনটন করবে। খুব উদ্যোগী হলে, নিজে শহরে এসে প্রচুর হাঁটাহাঁটি করে কোনোক্রমে পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন এক বছর দেড় বছর বাদে।

কোনো সম্পাদকই তাঁর লেখাটি পাঁচপাতা-দশপাতার বেশী পড়বেন না। কারণ, শতকরা পঞ্চাশভাগ ক্ষেত্রেই নিশ্চিত বলা যায়, সেটি তার বেশী আর পড়ার যোগ্য নয়। যদি যোগ্যও হয়, সম্পাদক

তার বেশী যেতে পারবেন না সময়ের অভাবে। সম্পাদকের হাতে এরকম অগাধ সময় থাকে না, যাতে তিনি ডাকে পাঠানো প্রত্যেকটি লেখাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ে দেখতে পারেন। তা ছাড়া খারাপ লেখা পড়তে পড়তে তিনি এত বিরক্ত হয়ে যান যে নির্ভর করতে বাধ্য হন বিশ্বাসযোগ্য লেখকদের ওপরে।

এর পর তিনি বুক ঠুকে বইটি পাঠাবেন কোনো প্রকাশকের ঠিকানায়। সেখানেও একই অবস্থা হবে, এক বছর দেড় বছর পর পাণ্ডুলিপি ফেরৎ আসবে। কোনো প্রথম শ্রেণীর প্রকাশকই সেটা ছাপতে রাজি হবেন না, তাদের কাছ থেকে ভদ্রতা-সূচক যে চিঠিটি আসবে তা অনেকটা এই মর্মের, 'আগামী তিন বছর আমাদের যে বইগুলি ছাপা হবে, তা আগে থেকেই ঠিক হয়ে গেছে। সুতরাং আপনার বইটি আমরা গ্রহণ করতে পারলাম না বলে দুঃখিত।" আসলে তাঁরাও বইটি পড়েননি। ছোটোখাটো দু'একটি অসাধু প্রতিষ্ঠান আছে, যাদের কাজ নতুন লেখকদের ঠকানো। যারা ঐ লেখককে প্রস্তাব দেবে যে আপনি নিজেই এখন ছাপার খরচ দিন, তারপর বিক্রি থেকে আপনাকে শোধ করে দেওয়া হবে, ইত্যাদি। ক্রমেই টাকার অঙ্ক বাড়বে, প্রকাশক কোনো হিসেব দেবে না, শেষ পর্যন্ত হয়তো বইটা ছাপাই হবে না, টাকাটা মারা যাবে' কিংবা ছাপা হলেও খুবই সামান্য কপি বিক্রি হবে।

তা হলে নতুন লেখকের উপায় কী? তিনি ভাববেন। তিনি একটা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাঁর গুণের সমাদর হবে না। সাহেবদের দেশে বেশীর ভাগ বড় বড় প্রকাশকেরই একজন-দু'জন মাইনে করা রীডার বা উপদেষ্টা থাকেন। তাঁদের কাজ সমস্ত পাণ্ডুলিপি পড়ে প্রকাশককে উপদেশ দেওয়া। এইভাবে সম্পূর্ণ নতুন কোনো লেখকের রচনাও ছাপা হতে পারে। সেই লেখক হতে পারেন রাতারাতি বিখ্যাত। যেমন সাহেবদের দেশের অনেক কিছুই আমাদের দেশে নেই, সেই রকম নেই কোনো প্রকাশকের উপদেষ্টা।

প্রকাশকরা নিজ বুদ্ধিতে যাচাই করেন লেখকদের বাজারদর, সেই অনুযায়ী বই ছাপেন। প্রকাশকরা জানেন, নাম-না-জানা লেখকের বই বিক্রি হয় না, তাই নতুন লেখকের পাণ্ডুলিপি বিবেচনাই করবেন না। এমন কথাও কোনো-কোনো প্রকাশককে বলতে শুনেছি, এক ভদ্রলোক আফ্রিকার ওপর একটা ভ্রমণ-কাহিনী লিখেছেন, বেশ ভালো লেখা, কিন্তু ছেপে কী হবে, কেউ কিনবে না! সুতরাং পত্র-পত্রিকায় নতুন লেখকের উপন্যাস ছাপার তবু যেটুকু সুযোগ আছে, প্রকাশকের কাছে তাও নেই।

তা হলে, সম্পূর্ণ নতুন লেখকদের আত্মপ্রকাশের উপায় কী? এ সম্পর্কে কয়েকজন পত্রপত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গেও কথা বলেছি। তাঁরা বলেন, ডাক মারফত আসা অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিই এত অপাঠ্য যে বিরক্তি ধরে যায়। বছরে অন্তত একশোটা এ-রকম আসে, অথচ তার মধ্যে একটাও—।

কেন এ-রকম হয়? আমাদের দেশে লেখকের সংখ্যা অনেক বেশী। অনেকেই মনে করে, অন্যান্য শিল্পকর্মের তুলনায় লেখার কাজটাই বুঝি সবচেয়ে সহজ। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কেও অনেকেরই ধারণা নেই। অনেক স্কুল মাস্টার বা পণ্ডিত ধরনের মানুষ মনে করেন, তাঁরা বাংলাভাষা খুব ভালো জানেন, সুতরাং বাংলায় সাহিত্য রচনার অধিকার আছে। কিন্তু তাঁরা সাহিত্যের অগ্রগতির ঠিক খবর রাখেন না। তাঁরা ভুলে যান যে, সাহিত্যকে সব সময় সমসাময়িক হতে হয়। ভাষাজ্ঞান আর সাহিত্যজ্ঞান এক নয়। এতো গেল পণ্ডিতদের কথা। এ ছাড়া যাঁদের ভাষাজ্ঞানও সম্পূর্ণ নয়, তাঁরাও উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেন, বাংলা ভাষায় অন্যান্য লেখকদের রচনা না-পড়েই তিনি রচনা করতে যান নতুন রচনা। এঁরা ভুলে যান যে, একজন লেখককে তৈরি হতে হয়, একজন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বা গায়ক যেমনভাবে নিজেকে তৈরি করেন।

তবু, একথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে যে, সত্যিকারের প্রতিভাবান কোনো লেখকও নিশ্চয়ই এই ভিড়ের মধ্যে অবহেলিত থেকে যাচ্ছেন। তাঁকে চিনে নেবার উপায় কী? এ-ব্যাপারে একটিই পথ খোলা আছে মনে হয়। আজকাল বড় বড় শারদীয় সংখ্যাগুলির প্রত্যেকটিতেই পাঁচ-ছটি করে উপন্যাস ছাপা হয়। এর মধ্যে একটি অন্তত ছাপা হোক নতুন কোনো লেখকের। দু'একটি পত্রিকায় এরকম একটি উদ্যোগ গত দু'তিন বছর ধরে দেখা গেছে, এটা আরও ছড়িয়ে পড়তে পারে। এবং এই নতুন লেখককে খোঁজা হোক একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে। একটি উপন্যাস প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হোক, তিনজন খ্যাতিমান লেখকের একটি কমিটি হোক তার বিচারক (এই লেখকদের যোগ্য পারিশ্রমিক না দিলে এঁরা মন দিয়ে বিচার করবেন না, বলা-ই বাহুল্য।) এঁদের বিচারে শ্রেষ্ঠ উপন্যাসটি যদি ছাপা হয়, তাহলে পাঠকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে এবং সেখানে আরও ভালোভাবে বিচার হয়ে যাবে এই নতুন লেখকের প্রতিভার।

আমাদের দেশে এখন অনেকগুলি সাহিত্য-পুরস্কার আছে অথচ প্রকৃত প্রতিভাবান নতুন লেখককে স্বীকৃতি দেবার কোনো পন্থা নেই। এটা একটা লজ্জার বিষয়। শুধু যে পত্র-পত্রিকাগুলিই এই ভার নেবে, তার কোনো মানে নেই, নিতে পারেন বিভিন্ন প্রকাশক কিংবা পুরস্কার কমিটি। এমনকি নানান ওষুধের কোম্পানি বা চুলের তেলের ব্যবসায়ী, যাঁরা বিজ্ঞাপনে অনেক টাকা ব্যয় করেন, এই ব্যাপারেও কিছু ব্যয় করতে পারেন। এক চুলের তেলের কোম্পানির উদ্যোগে এক প্রতিযোগিতাতেই বাংলা সাহিত্য পেয়েছিল একজন নতুন লেখককে, যাঁর নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আমার পরিচিতি এক লেখকের বাড়িতে মাঝে মাঝে সকালবেলা চা খেতে যাই। তিনি আগেই আমাকে বলে দিয়েছিলেন যে, তিনি সাধারণত সকালবেলা লেখেন না, তাঁর লেখার সময় রাত্রিকাল। খুব জরুরী কোনো লেখার ব্যাপার না থাকলে তিনি শনি-রবি-সোম, এই তিনটি সকালে কিছুতেই কাগজ কলম নিয়ে বসেন না। সুতরাং তাঁকে বিরক্ত করা হবে না জেনে নিয়েই যাই আমি।

আরো অনেকে আসে। লেখক মহাশয় বেশ জনপ্রিয়, সুতরাং তাঁর কাছে ভক্তরা আসবেই। নবীন লেখকরাও আসে। সেই সময় আমি হংস মধ্যে বকের মতন এক কোণে চুপ করে বসে বসে সিগারেট টানি; আগন্তুকদের নানা রকম প্রশ্ন শুনে সমাজ বিষয়ে অনেক শিক্ষা হয়।

যারা সাহিত্যিক নয়, শুধুই ভক্ত, তাদের অনেকের মুখেই—একটা প্রশ্ন শুনি। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরই তারা লেখককে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা আপনি লেখেন কেন? কেন হঠাৎ লিখতে শুরু করলেন একদিন?

আমার পরিচিত লেখকটি খুব একটা সুবক্তা নন। তাঁর উত্তরগুলো কাটা কাটা। ঐ প্রশ্নটি শুনেই তিনি সংক্ষেপে উত্তর দেন, কেন, টাকার জন্য। লিখে টাকা পাই তাই লিখি।

এ উত্তরটা কারুরই মনঃপূত হয় না। খুব তরুণবয়েসী ছেলে মেয়েরা রীতিমতন মনে দুঃখ পায়। যে-লেখকের রচনা পড়ে তারা বিচলিত উদ্বেলিত হয়, রাত্রে ঘুম আসে না—তিনি কিনা সামান্য টাকা পয়সার জন্য ঐ সব লেখেন? তারা আরো নানা রকম জেরা করে আর লেখকটি মুচকি মুচকি হাসতে থাকেন।

অবশ্য তিনি সব সময় ঐ একই উত্তর দেন না। মেয়েদের সামনে মানুষ মাত্রই একটু দুর্বল হয়ে পড়ে। লেখকদের পক্ষে আরও বেশী দুর্বল হয়ে পড়া স্বাভাবিক। আমি লক্ষ করেছি, ভক্ত পাঠকের বদলে ভক্ত পাঠিকারা এলে লেখক মহাশয় একটু বেশী কথাবার্তা বলেন।

মেয়েরাও ঐ প্রশ্নটি করে। আপনি লেখেন কেন?

তিনি উত্তর দেন, টাকার জন্য।

তারপর মেয়েদের আশা ভগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, কী, উত্তরটা পছন্দ হলো না? তা হলে আর একটু বলি, আমার বুকের মধ্যে যে নিরুদ্ধ বেদনা, যে শত শত মূক কল্পনা সব সময় আমার কাছে প্রকাশের দাবি জানায়—আমি তাদের ভাষা না দিয়ে পারি না। চারিদিকে যত দুঃখী নারী-পুরুষ দেখি, এই সমাজের যত অনাচার ব্যভিচার দেখি, ততই আমার মনে হয়, আমার লেখনিতে এর একটা চিত্র ফুটিয়ে তুলতেই হবে। তাই আমি না লিখে পারি না।

লেখক যখন এই সব কথা বলতে থাকেন, তখন আমার পক্ষে হাসি সামলানো শক্ত হয়। লেখকের কণ্ঠস্বরে যদিও সূক্ষ্ম ইয়ার্কির সুর থাকে, কিন্তু তার ভক্তরা সেটা বুঝতে পারে না। ভক্তরা এই দ্বিতীয় উত্তরটি শুনেই খুশী হয়। একথা ঠিক, আমাদের দেশের বেশীর ভাগ মানুষই বড় বড় ফাঁকা ফাঁকা কথা শুনতে ভালোবাসে। লেখকের ঐ ইয়ার্কিভরা উত্তর শুনেই তাঁর ভক্ত পাঠক-পাঠিকারা মুগ্ধ হয়ে তাঁর অটোগ্রাফ চায়।

একজন লেখক কেন লেখে, এ-প্রশ্নের যে কোনো উত্তরই হয় না, এটা তাদের মাথায় আসে না। তিনি লিখতে জানেন, তাই লিখছেন। তিনি ছবি আঁকতে জানলে ছবি আঁকতেন, গান জানলে গায়ক হতেন। বাংলা কথা।

লেখক নয় এমন ভক্তরা এসে আর একটি কথাও বলে। মেয়েরাই বেশী বলে। আমাকে একটু লিখতে শিখিয়ে দেবেন?

লেখক তখন আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, লেখা যদি কারুকে শেখানো যেতো তা হলে আমি তো ওকেই শেখাতে পারতাম। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও তো ওর কিছু হলো না।

আমি তখন পত্রিকার আড়ালে মুখ লুকোই।

ভক্তরা ছাড়ে না। তারা আমার দিকে ঈষৎ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকায়! অর্থাৎ উনি শিখতে পারেননি বলেই যে আমরা শিখতে পারবো না, তার তো কোনো মানে নেই। সকলে তো স্কুল ফাইন্যালও পাস করতে পারে না।

ভক্তদের পুনঃ পুনঃ সনির্বন্ধ অনুরোধে লেখক তখন বলেন, আচ্ছা শিখিয়ে দেবো। তার বদলে আপনি আমাকে কী শেখাবেন?

এ-পর্যন্ত এই প্রশ্নের উত্তর একজনকেও দিতে শুনিনি।

আবার অনেকে এসে প্রশ্ন করে, আপনি যা লেখেন সব কি সত্যি ঘটনা?

লেখক অম্লান বদনে উত্তর দেন, সব সত্যি ঘটনা।

তখন তারা বিভিন্ন উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের নাম উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করে, এরা সব সত্যি? আপনি এদের দেখেছেন?

লেখক বারবার একই কথা বলে যান, সব সত্যি।

প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার, ঐ লেখক অন্তত পঞ্চাশখানা বই লিখেছেন। সেই সব বইতে বর্ণিত ঘটনা সত্যি কি না জানার জন্য সাধারণ কৌতূহল থাকে অনেকের। একবারও মনে এই প্রশ্ন জাগে না, সাহিত্যের সত্য আর জীবনের বাস্তব সত্য এক কি না। বাংলায় 'সত্য' এই কথাটার অর্থ অনেক ব্যাপক, আসল সত্য তাই ধরা পড়ে না।

কয়েকবার ঐ লেখকের বাড়িতে এই রকম সব প্রশ্নোত্তর শুনে আমার ধারণা হয়েছে যে, লেখক আর পাঠকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগ বোধহয় কিছুতেই সম্ভব নয়। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি এতই মামুলি হয় যে মনে হতে পারে সময়ের অপব্যবহার। আসলে

পাঠকরা লেখকদের কাছে আসে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে। তারা ভাবে, বই পড়ার সময় লেখককে যত আপন, যত কাছের মানুষ মনে হয়, ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ঠিক সেই রকম হবেন। পাঠক সামনে এসে উপস্থিত হওয়ামাত্রই লেখক গড়গড় করে বলতে শুরু করবেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবন বা সমস্ত অনুভূতির কথা। আর পাঠকও লেখকের কাছে ঠিক মতন প্রকাশ করতে পারে না, সে কী শুনতে চায়। সেইজন্যই তার প্রশ্নগুলি অতি সাধারণ হয়ে আসে।

কোনো লেখক যদি তাঁর ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্তার হুবহু বর্ণনা লিখে আমাদের উপহার দেন, তা হলে সেটা খুবই একটা সুখপাঠ্য রচনা হতে পারে। কিন্তু কোনো লেখকই তা লিখবেন না জানি। সেটা শুধু তাঁর ভক্তদের কারণেই নয়, নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করতেই বা কজনে পারেন ?

সাহিত্যে নতুন লেখকদের একটা কোনো আন্দোলন বা হুজুগ না থাকলে ব্যাপারটা জমজমাট হয় না। নতুনরা অনেক কিছু ভাঙতে চাইবে আর রক্ষণশীলরা হইচই করে আপত্তি তুলবে—এটাই স্বাভাবিক ; এই ভাঙাগড়ার খেলায় যা জন্মায়, তা কখনো বিফল হয় না।

অনেকদিন সেরকম কোনো টাটকা তেজী আন্দোলনের কথা শুনছি না তো!

কয়েক বছর ধরে আমাদের এখানকার রাজনীতিতে উগ্রপন্থীদের কীর্তিকলাপ সকলকেই সচকিত করেছে। আমরা শুনেছি এদের মধ্যে অনেক ভালো ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীও ছিলেন—কিন্তু এই উগ্রপন্থীদের সাহিত্য সংক্রান্ত রচনার প্রায় কোনো নিদর্শনই নেই এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনা। আমি খোলা মন নিয়ে এঁদের রচনা পাঠ করতে আগ্রহী ছিলাম, বিশেষ কিছু পাইনি, যা পেয়েছি তা অকিঞ্চিৎকর।

সব মিলিয়ে আমাদের দেশে বামপন্থী আন্দোলন-সঞ্জাত উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনার দৃষ্টান্তই খুব কম। এটাও খানিকটা অবাক হবার মতনই ঘটনা। অন্যান্য দেশের উদাহরণের সঙ্গে এটা ঠিক মেলে না। লেখা যদি ভালো হয়, মতবাদ যা-ই হোক, সকলেরই ভালো লাগবে। বামপন্থীরা গর্কির 'মা' উপন্যাস কিংবা লু স্যুন বা লাওচাও-এর রচনার প্রশংসা করেন, সকলেরই তো ওঁদের লেখা ভালো লাগে। যে-কোনো প্রতিক্রিয়াশীল পাঠকই গর্কির 'মা' উপন্যাসটিকে পছন্দ করবেন, কারণ ঐ লেখাটি সাহিত্য হয়ে উঠতে পেরেছে।

শোলোকভের বইগুলি পড়ে আমরা অভিভূত হই, যেমন ভালো লাগে জেমস জয়েস বা টমাস মান।

আমাদের এখানকার বামপন্থী পত্র-পত্রিকাগুলিতে উৎকৃষ্ট সাহিত্য না থাকলেও, সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের ধারাটি সম্পর্কে প্রচুর গালাগালি থাকে। এই গালাগালি বেশ বোকা বোকা ধরনের। এতে আদর্শের বিশেষ স্থান নেই, বেশীর ভাগই ঈর্ষাপ্রসূত এবং গায়ের জ্বালা মেটানো। কী ধরনের সাহিত্য আমরা চাই না, এটা বললেই তো হবে না, কী ধরনের সাহিত্য আমরা চাই সেটাও বলতে হবে। এবং তার দৃষ্টান্ত দিতে হবে, এ-দেশী রচনা থেকে। শুধু কতকগুলি থিয়োরি জানালেই চলবে না।

কোনো কোনো পত্র-পত্রিকায় দেখি বিষ্ণু দে-কে বামপন্থী কবি বলা হয়। বিষ্ণু দে বড় কবি এবং হতে পারেন মানুষ হিসেবে বামপন্থী, কিন্তু তাঁর রচনাগুলি শ্রমিক-কৃষকের দুঃখ-আশার ভাষায় শামিল এমন দাবি যদি কেউ করেন, তবে তাঁকে উন্মাদ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। বামপন্থীদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সার্থকতম কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু কোনো কোনো পত্র-পত্রিকায় দেখেছি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়কেও আবার শোধনবাদী বলে নিন্দা করা হয়েছে। যাঁরা ঐ রকম নিন্দা করেছেন, তাঁরা কিন্তু ওঁদের মতে সার্থক কোনো কবিকে আজ পর্যন্ত দেখাতে পারেননি। এটা বড়ই লজ্জার কথা। অন্যকে খারাপ বলবো, অথচ নিজে ভালো হতে পারবো না, এ আবার কী-রকম নিয়ম?

বামপন্থীদের গালাগালি সম্পর্কে আরও একটা কথা আছে। আজ তাঁরা যে-সব প্রতিষ্ঠান বা পত্র-পত্রিকাকে গালাগালি দিচ্ছেন, আগামীকালই তাঁরা নিজেরাই সেইসব প্রতিষ্ঠান বা পত্র-পত্রিকার আশ্রয় চাইতে পারেন। এ রকম দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি।

মার্কসবাদের বিচারে সাহিত্য-আলোচনার রীতিটিও এদেশে

ঋড় অদ্ভুত। কোন্ লেখক কোথায় চাকরি করেন এবং কার সঙ্গে মেশেন—এই নিয়ে তাঁর সাহিত্যের বিচার হয়।

একটা কথা খুব জোর দিয়ে বলার সময় এসেছে যে, যাঁরা তথাকথিত মার্কামারা বামপন্থী নন কিংবা এ-সব পার্টির সদস্য নন—এমন অনেক বাঙালী লেখকের রচনায় সত্যিকারের মানবতাবাদ এবং শ্রেণীহীন সমাজের চিন্তা প্রতিফলিত হয়। যে-কোনো বামপন্থী দলে গিয়ে ভিড়লেই মানবতাবাদের ইজারা পাওয়া যায় না। যে লেখক বামপন্থী দলে নাম লেখাননি, তিনিই অর্থলোভী কিংবা সুবিধালোভী—এরকম একটা প্রচার ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। একথা এখন বলা প্রয়োজন যে যাঁরা ঐ-সব প্রচার করেছেন, তাঁরা অনেকেই অসৎ এবং মিথ্যুক। একজন লোক সম্পর্কে ভালো করে না জেনেই যদি তাঁকে কেউ চুটিয়ে নিন্দে করে তা হলে বুঝতে হবে, ঐ নিন্দাকারীর কোনো আদর্শ নেই। কিংবা তাঁর আদর্শই এই, যে আমার নিজের দলের নয়, তাকেই নিন্দে করো। এ-রকম আদর্শ কোনো মহৎ পথে মানুষকে নিয়ে যেতে পারে না।

আমাদের দেশের বামপন্থীদের বরং এই কথাটা এখন ভালো করে ভেবে দেখার সময় এসেছে যে, কেন তাঁরা সকল লেখকদের আকৃষ্ট করতে পারছেন না নিজেদের দিকে। কিংবা কেন তাঁদের নিজেদের মধ্য থেকে একজনও সার্থক লেখক উঠে আসছেন না। শুধু সমালোচনা বা গালাগালি করলেই তো আর সাহিত্য প্রগতিবাদী হয়ে ওঠে না। নিজেরা ভালো মতন লিখতে জানলে পাঠকরা ঠিকই গ্রহণ করবে। নিছক আশাবাদ আর জঙ্গী কথাবার্তা থাকলেই সেটা জনগণের প্রেরণার কারণ হয় না। কারণ, জনগণ সেটা পড়েই দেখবে না। যা-ই হোক, সাহিত্যে একটা কোনো নতুন আন্দোলন শুরু হবার এখন সময় এসেছে।

আজকাল মাঝেমাঝেই দেখা যায়, এক-একটা জেলার সাহিত্যিকদের নিয়ে কোথাও সমাবেশ হচ্ছে। তখন নানান লেখককে খুঁজে বার করা যে, তাঁদের আদিবাস কোন জেলায়। ধরা যাক নদীয়া জেলায় যে-লেখকের পৈতৃক বাসস্থান ছিল, কিন্তু তিনি সেখানে গত কুড়ি-পঁচিশ বছর থাকেননি, তাঁকেও নদীয়া জেলা সাহিত্য সম্মেলনে উপস্থিত থাকতেই হবে, না হলে উদ্যোক্তারা ছাড়বেন না। বাংলা ভাষায় জীবিত লেখকদের মধ্যে অবশ্য এখনো অনেকেরই আদিবাস পূর্ববঙ্গে। তাঁরা এখন কলকাতায় ভিড় করেছেন বলে কোনো জেলা থেকেই তাঁদের আর ডাকা হয় না। অবশ্য এজন্য তাঁদের কোনো আফশোস আছে—এমন কথাও শোনা যায়নি।

প্রতি জেলা থেকেই কিছু পত্র-পত্রিকা বেরোয়। এই সব পত্র-পত্রিকাতেও এরকম কৌতুকজনক ব্যাপার চোখে পড়ে যে অমুকচন্দ্র অমুক হচ্ছেন অমুক জিলার শ্রেষ্ঠ লেখক। কিংবা এই জেলায় প্রখ্যাত লেখকদের মধ্যে আছেন অমুক অমুক লেখক। কোনো একজন লোক হয়তো চাকরিতে বদলি হয়ে বাঁকুড়া বা বর্ধমানের কোনো জায়গায় বি ডি ও হয়েছেন। তিনি কবিতাও লেখেন। অমনি তিনি হয়ে গেলেন সেই জেলার কবি।

এই ব্যাপারটা ভালো না। এরকম সংকীর্ণ দৃষ্টি সাহিত্যের কোনো উপকার করে না। বাংলা ভাষায় যিনি লিখবেন, তাঁকে বাংলা ভাষারই লেখক হিসেবে স্থান করে নিতে হবে। কোনো জেলার মধ্যেই শুধু নয়।

এই জেলা-ভিত্তিক সাহিত্য বিচারের মূলে আছে কলকাতার

প্রতি অভিমান। অনেকেরই ধারণা, কলকাতা থেকেই বড় বড় পত্র-পত্রিকা বেরোয়, আর সেখানে শুধু স্থান পান কলকাতার লেখকরাই। বাইরের লেখকদের লেখা সেখানে গ্রহণ করা হয় না।

আমরা আরও কয়েকবার এই বিভাগে আলোচনা করেছি যে, এই ধারণা সম্পূর্ণ অলীক। প্রতিটি পত্রিকারই উদ্দেশ্য ভালো লেখা প্রকাশ করা। ভালো লেখা না দিয়ে শুধু চেনাশুনোদের লেখা দিয়ে কাগজ ভরালে সে পত্রিকা চলবে কেন? আমি এই কথা আরও একবার আলোচনা করছি এই জন্যই যে, অনেক নবীন লেখককে আমি দেখি যাদের এখনো নিজের লেখা কী করে ভালো হবে সেদিকে মন নেই, শুধু লেখা কী করে ছাপা হবে সেই দিকেই বেশী মনোযোগ। কোনো লেখা অমনোনীত হলেই তারা ধরে নেয় যে, ঐ পত্রিকায় নানান চক্রান্ত আছে বলেই তার লেখা ছাপা হচ্ছে না। একবার কি মনে এই সন্দেহ উঁকি দেয় না যে, আমার লেখাটা ভালো হয়নি? অনেক পত্রিকাতেই যে নামকরা লেখকদের অনেকের বাজে লেখা ছাপা হয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, নাম-করা লেখকদের দায়িত্ব সেই পত্রিকার নয়। খ্যাতনামা লেখকরা সরাসরি পাঠকদের কাছে দায়িত্ববদ্ধ। পাঠকদের কাছে তাঁদের নাম ঠিক থাকলো কি না সে তাঁরাই বুঝবেন। পাঠকরা না চাইলে তাঁদের লেখাও ক্রমশ কম ছাপা হতে থাকবে।

কিন্তু নবীন লেখকদের সম্পর্কে সে-কথা খাটে না। অনেক নতুন লেখকের মধ্যে থেকে যাঁদের বাছাই করে নেওয়া হচ্ছে, তাঁদের রচনায় সত্যিই নতুন কিছু থাকা চাই।

প্রথম প্রথম সাহিত্যচর্চায় কতকগুলো অসুবিধের কথা আমি এখানে উল্লেখ করছি। প্রথম জীবনে নিজের লেখা সম্পর্কে অনেকেরই সঠিক ধারণা থাকে না। কেউ কেউ মনে করে, যা লিখেছি তা-ই অমর করে দেবে আমাকে। এর ওপর যদি কোনো বন্ধু-বান্ধব বা কোনো বালিকা সেই লেখার প্রশংসা করে, তা হলে

তো আর কথাই নেই। আবার কেউ কেউ নিজের লেখা সম্পর্কে অতিরিক্ত কুণ্ঠিত। কারুকে দেখাতেই চায় না।

আসলে, নিজের লেখার সঠিক বিচারক হতে হবে নিজেকেই। সেজন্য ধারণাটা স্বচ্ছ করা দরকার। বাংলা ভাষায় যে লিখছে, গোটা বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তার মোটামুটি পরিচয় থাকা চাই। নইলে সে নিজের লেখাও চিনতে পারবে না। তার আগে অবশ্য তাকে ঠিক করে নিতে হবে সত্যিই সে লেখক হতে চায় কি না। শখে পড়ে কিংবা বন্ধু-বান্ধবদের দেখাদেখি অনেকেই লিখতে শুরু করে। তারপর চাকরি-বাকরি পেলে কিংবা বিয়ে করলে ছেড়ে দেয়। এই সব লেখক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে না, কিংবা ভালো পাঠকও হয় না।

লেখক কিংবা পাঠক হওয়া, দুটোর মধ্যেই খানিকটা রহস্য আছে। একই পরিবারে চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ের মধ্যে দু' একজন সাহিত্য পাঠ করতে ভালোবাসে, বাকিরা পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কোনো বই উল্টেও দেখে না। কিংবা ট্রেনে যাবার সময় রহস্য কাহিনী পড়ে। কিংবা সিনেমার কাগজে গল্প উপন্যাস পড়ে লেখকদের নাম ভুলে যায়। এরা সাহিত্যেব কেউ নয়। আর বাকি দু' একজন যে কেন টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে রবীন্দ্র-রচনাবলী কেনে সে-ও একটা রহস্য তো বটেই। সেই রকম, একই স্কুল বা কলেজের কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র দু' তিনজনের ঝোঁক থাকে সাহিত্য রচনার দিকে। এর সঙ্গে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার কোনো সম্পর্ক নেই।

সাহিত্য রচনা করা খ্যাতির কোনো সহজ উপায় নয়। যে-কোনো পেশার মতনই এ-ব্যাপারেও অনেক পরিশ্রম করতে হয়। নিজেকে তৈরি করে নিতে হয়। জীবনে অনেক ঝুঁকি নিতে হয়। মনে রাখতে হবে, তার সামনে পড়ে আছে দীর্ঘ দুঃখময় পথ। নইলে কোনোক্রমে পাড়ার বা মহকুমার বা জেলার কাগজে দু' একটা লেখা ছাপিয়ে যে ছেলেখেলা, তার কোনো মূল্যই নেই।

সানডে টাইমস পত্রিকায় ৩১মে সংখ্যায় এক পাতা জুড়ে বরিস পাস্তেরনাকের বই ডঃ জিভাগো-র প্রকাশের ইতিহাস নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক লেখা বেরিয়েছে। লিখেছেন ডঃ জিভাগো-র ইটালিয়ান প্রকাশক গিয়ানগিয়াকামো ফেলত্রিনেল্লি। ফেলত্রিনেল্লি বিশ্বের বৃহত্তম প্রকাশকদের অন্যতম। শুধু যে বরিস পাস্তেরনাকের ডঃ জিভাগো-র ইতিহাসই রোমাঞ্চকর, তা-ই নয়; প্রকাশকের কাহিনীও কম রোমহর্ষক নয়। ফেলত্রিনেল্লি নিজেও একজন উগ্র বামপন্থী—এবং ইটালিতে বর্তমান হিংসাত্মক রাজনৈতিক কার্যকলাপের সমর্থক বলে পুলিশ তাঁর নামে হুলিয়া বার করেছে, তিনি বিদেশে পলাতক এবং এই রচনা লেখার সময়ও তাঁর বর্তমান ঠিকানা কেউ জানে না।

ফেলত্রিনেল্লির প্রকাশনালয় স্থাপিত হয়েছে ১৯৫৫ সালে। সেই সময় তিনি সারগিও দ' আনজেলো নামে রোমের ইটালিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টির বইয়ের দোকানের ম্যানেজারের সঙ্গেও একটা চুক্তি করেন। দ' আনজেলো যখন রাশিয়ায় যাবেন তখন তিনি ফেলত্রিনেল্লির প্রকাশনালয়ের জন্য প্রতিভাবান রুশ লেখকদের বইয়ের খোঁজ করবেন, লিটারেরি স্কাউট যাকে বলে। দ' আনজেলো খবর আনলেন বরিস পাস্তেরনাক নামে এক রুশ কবির লেখা উপন্যাসের নাম ডঃ জিভাগো। ডঃ জিভাগো তখন রুশ দেশে ছাপার তোড়জোড় চলছে। ফেলত্রিনেল্লি উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি এবং ইটালিয়ান ভাষায় বইটি ছাপার অনুমতি পেয়ে গেলেন পাস্তেরনাকের কাছ থেকে।

ফেলত্রিনেল্লি নিজে কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থক, ডঃ জিভাগো বইটি পড়ে তার মধ্যে সোভিয়েট বিরোধী কোনো বিষয় তাঁর চোখে পড়েনি। তবু তিনি শুনতে পেলেন যে, বইটি রাশিয়ায় ছাপা হতে দেরী হবে। ইটালিয়ান ভাষায় বইটি ছাপা হচ্ছে কি না জানার জন্য সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ইটালির কম্যুনিস্ট পার্টিকে খোঁজ নিতে অনুরোধ করলেন। এ ব্যাপারে স্বয়ং তোগলিয়াত্তি দেখা করলেন ফেলত্রিনেল্লির সঙ্গে। তোগলিয়াত্তি বইটি ছাপতে নিষেধ করেননি, তবে কিছুদিন অপেক্ষা করতে বললেন, যাতে রুশ সংস্করণের আগে না বেরোয়।

এর পর শোনা গেল যে, রুশ দেশে বইটি আর ছাপাই হবে না। ক্ষুব্ধ অভিমানে লেখক পাস্তেরনাক ফেলত্রিনেল্লিকে চিঠি লিখে জানালেন যে, তাঁর বইয়ের ইটালিয়ান বা অন্য ভাষার সংস্করণের অধিকার তিনি ফেলত্রিনেল্লিকে দিচ্ছেন। এবং কোনো কারণে যদি পাস্তেরনাকের কাছ থেকে আর চিঠিপত্র না আসে, তাহলেও যেন ছাপার কাজ বন্ধ না হয়।

এরপর সোভিয়েট লেখক ইউনিয়নের সভাপতি সুরকভ দেখা করতে আসেন ফেলত্রিনেল্লির সঙ্গে। বইটা ছাপা বন্ধ করতে। তিন ঘণ্টা ধরে দু'জনের তর্ক হয়—এবং সে চিৎকার নাকি অফিসের সব কর্মচারী শুনতে পেয়েছিল।

১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে ইটালীতে 'ডঃ জিভাগো' প্রথম ছাপা হয়ে বেরুলো। প্রথম প্রথম বইটি নিয়ে তেমন কোনো সাড়া পড়েনি। সাহিত্য-রসিক ও সমালোচকরা বইটির সাহিত্যগুণের প্রশংসা করেছিলেন। ফেলত্রিনেল্লির মতে, পশ্চিমের রুশ বিরোধী বুদ্ধিজীবীরা এবং সি. আই এ-র দালালরাই বইটিকে সোভিয়েট বিরোধী বলে চিহ্নিত ক'রে মাতামাতি করে এবং সোভিয়েট কর্তৃপক্ষও তাতে বেশী গুরুত্ব দেয়। ফেলত্রিনেল্লি জোর দিয়ে বলেছেন যে, 'ডঃ জিভাগো'কে তিনি কখনো সোভিয়েট বিরোধী

বই বলে মনে করেননি এবং জীবনে কখনো তিনি কোনো সোভিয়েট বিরোধী বই ছাপাননি।

এর পরের ইতিহাস অনেকেরই জানা। পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। এর পরের ঘটনা হচ্ছে, 'ডঃ জিভাগো' বইটি যখন হু হু করে বিক্রী হতে থাকে, তখন লেখকের প্রাপ্য রয়্যালটি নিয়ে কী করা হবে। যেহেতু পাস্তেরনাকের সঙ্গে ইটালিয়ান প্রকাশকের রয়্যালটির শর্ত নিয়ে লিখিত কোনো চুক্তি হয়নি, সেই জন্য তিনি লেখককে এক পয়সাও না দিলে পারতেন। কিন্তু বইটি থেকে বিপুল লাভ হয় এবং প্রকাশক তার থেকে লেখকের ভাগ আলাদা জমা করে রাখতেন।

পাস্তেরনাক নিজে এই বই বাবদ টাকা নেননি, কারণ তাঁর দেশে তাঁর বিরুদ্ধে যে প্রচার চলছিল, টাকা নিলে তা আরও জোরদার হতো এবং অর্থ অন্য রকম দাঁড়াতো। তিনি মাঝে-মাঝে প্রকাশককে চিঠি লিখে অনুরোধ জানাতেন, পশ্চিমের বিভিন্ন ব্যক্তিকে তাঁর নাম করে ক্যাশ টাকা উপহার হিসেবে পাঠাতে। এ রকমভাবে প্রায় দশ লাখ টাকা বিভিন্ন ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে।

১৯৬০ সালে পাস্তেরনাকের এক দূত এসে সাড়ে সাত লাখ টাকা আবার দাবি করলো এবং জানালো যে, এই টাকা সে গোপনে রাশিয়ায় নিয়ে যাবে। ফেলত্রিনেল্লি এই ব্যাপারটা পছন্দ করেননি, কারণ, এই ঘটনা জানাজানি হলে সোভিয়েট দেশে পাস্তেরনাকের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হবে। পাস্তেরনাক এরকম অনুরোধ করলেনই বা কেন, তাঁর স্বাস্থ্য তখন ভগ্ন, মনের জোরও কি নষ্ট হয়ে গেছে? (এর কয়েক মাস বাদেই পাস্তেরনাক মারা যান।) যা-ই হোক ফেলত্রিনেল্লি সেই টাকা দিয়ে দিলেন।

দূতটি সেই টাকা প্রথমে পাস্তেরনাককে দেবার চেষ্টা করে; পাস্তেরনাকের আকস্মিক মৃত্যুর পর সেই টাকা দিতে যায়, লেখকের

প্রেমিকা ওলগা ইভন্‌স্কায়া-কে (এঁর আদলেই ডঃ জিভাগোর লারা চরিত্রটি গড়া হয়েছে)। বিদেশ থেকে আনা টাকা গ্রহণ করার অভিযোগে ওলগা'র আট বছর জেল হয়। ফেলত্রিনেল্লির মতে সোভিয়েট গোপন পুলিশ বিভাগই সম্ভবত পাস্তেরনাক এবং ওলগা ইভনস্কায়াকে অপদস্থ করার জন্য এই টাকার ফাঁদটি পেতেছিল।

যা-ই হোক, এর পর পাস্তেরনাকের সঞ্চিত অর্থের অনেক দাবিদার আসে, কয়েকটি মামলাও হয়। লেখক পাস্তেরনাক এই বইটি দীর্ঘ পরিশ্রমে রচনার পর স্বদেশে অপদস্থ হয়েছেন, নোবেল প্রাইজ পেয়েও নিতে পারেননি, দুঃখিত, ভগ্নমনোরথ হয়ে মৃত্যু বরণ করছেন, আর তাঁর সেই বইয়ের জন্যই লক্ষ লক্ষ টাকা জমা পড়ে থেকেছে অন্যত্র।

এই বই বাবদ (বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ ও ফিল্ম রাইট সমেত) পাস্তেরনাকের নামে প্রায় সত্তর-আশি লক্ষ টাকার কাছাকাছি জমা হয়েছে। কয়েক বছর আগে ইন্টারন্যাশনাল জুরিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অব মস্কো, যাঁরা সোভিয়েট দেশে আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাপার নিয়ে কাজ করেন, তাঁদের এক প্রতিনিধি দল ফেলত্রিনেল্লির সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা জানান যে, তাঁরা পাস্তেরনাকের উত্তরাধিকারীদের প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং তাঁরা টাকাটার ব্যাপারে একটা নিষ্পত্তি করতে চান। শেষ পর্যন্ত এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে ওঁদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছে এবং ফেলত্রিনেল্লি মার্কিন ডলারে ঐ বিপুল টাকার অঙ্ক রাশিয়ায় পাঠাতে স্বীকৃত হয়েছেন। ফেলত্রিনেল্লির মতে, এই টাকাটা দিতে পারলে তিনি যে শুধু বিবেকের দায় থেকে মুক্ত হবেন তা-ই নয়, যেহেতু সোভিয়েট কর্তৃপক্ষই টাকাটা নেবার ব্যবস্থা করছেন, তখন তাঁরা নিশ্চয়ই এখন থেকে পাস্তেরনাক সম্পর্কে তাঁদের বিরূপ মনোভাবও মুছে ফেলবেন এবং রাশিয়ায় পাস্তেরনাকের লুপ্ত সম্মান আবার প্রতিষ্ঠিত হবে।

সাহিত্য ও সরকার

কয়েকদিন আগে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক থেকে প্রেরিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। কিছু একটা ব্যাপারে তিনি একটি পরিসংখ্যান তৈরি করতে চান। একটু বাদেই বুঝলাম, তাঁর সমস্ত প্রশ্নই সাহিত্য ও সাহিত্যিক সংক্রান্ত। সাহিত্য সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার হঠাৎ উৎসাহী হয়ে উঠলেন কেন, তা আমার বুদ্ধির অগম্য।

অনেক প্রশ্ন, উত্তর দিতে প্রায় ঘণ্টা খানেক লাগে। যথাসম্ভব সংক্ষেপেই আমি উত্তর দিচ্ছিলাম। একটি প্রশ্নের উত্তর শুনে আমার প্রশ্নকর্তা একটু থতমত খেলেন। তাঁর সেই প্রশ্নটি ছিল এই যে, সরকারের কাছ থেকে সাহিত্যিকরা কী সুযোগ-সুবিধে আশা করেন?

আমি বলেছিলাম, কিচ্ছু না।

তিনি অবাক হয়ে আবার প্রশ্ন করলেন, কিচ্ছু না? মানে আমার প্রশ্ন ছিল এই যে, সাহিত্যিকদের সম্পর্কে সরকারের কি কোনো দায়িত্ব নেই? সরকার কি তার কর্তব্য ঠিক মতন পালন করছে?

এই প্রশ্নটি নিয়েই এবার আলোচনা করা যেতে পারে। আমার তো মনে হয়, সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের থেকে সরকার যত বেশী দূরে থাকে ততই মঙ্গল। যে-কোনো রাজনৈতিক মতবাদ বা যে-কোনো দলই সরকার গঠন করুক না কেন, সাহিত্যের ব্যাপারে সরকার মাথা গলাতে এলেই নানা রকম বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা।

ভাষার উন্নতি বা 'শিক্ষা-বিস্তারের জন্য সরকারের যে অনেক

দায়িত্ব আছে, তা বলা-ই বাহুল্য। এবং সে ব্যাপারে কাজ যে বিশেষ কিছুই হয়নি, তাও সবারই জানা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রন্থাগার বিস্তারের জন্যও প্রচুর সরকারী উদ্যোগের অবকাশ আছে। সুতরাং এত সব ব্যাপারের পর সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আর সরকারের মেধা খরচ না করাই ভালো।

অনেকে এমন কথা বলে থাকেন যে, যেহেতু সাহিত্য রচনাও এক প্রকারের সমাজসেবা—সেই জন্যই সমাজ এবং তার প্রতিভূ সরকারের কিছু কিছু কর্তব্য থাকা উচিত সাহিত্যিকদের প্রতি। সাহিত্যিকদের ভ্রমণের সুযোগ, টেলিফোনের সুলভ ব্যবস্থা, এমনকি ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপারে সুবিবেচনা ইত্যাদিও কেউ কেউ কখনো দাবি করেছেন। কিন্তু আমার মতে, এগুলি অপ্রয়োজনীয়—বেশী সুযোগ-সুবিধে পেয়ে কোনো দেশের কোনো সাহিত্যিকের বেশী উপকার হয়েছে কিংবা রচনায় উন্নতি হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত নেই। আমার মতে, সরকারী উদ্যোগে বিতরিত পুরস্কারগুলিও অবাস্তর। কোনোটারই আর তেমন কোনো সম্মান আছে বলে মনে হয় না। যে-কোনো সরকারী ব্যবস্থা মানেই আইনকানুনের জটিলতা। এই ফাইল চালাচালির জটিল জঙ্গল থেকে অনেক সময় যা বেরিয়ে আসে, তা হাস্যকর।

সরকার যদি সাহিত্যিকদের কোনো সুযোগ-সুবিধে দেয়, তার বিনিময়ে সরকারও নিশ্চিত সাহিত্যিকদের কাছ থেকে একটা কিছু চাইবে। আর কিছু না হোক, আনুগত্য। এই বিনিময়ের ফল কখনো শুভ হতে পারে না।

সাহিত্য তখনই সমৃদ্ধ হয়, যখন তা স্বাধীন থাকে। রাজসভা বা জমিদারী পৃষ্ঠপোষকতার আমল ছেড়ে সাহিত্য এখন জনসমাজের কাছে পৌঁছে গেছে। একজন সাহিত্যিক সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারেন। তাহলে আর মধ্যবর্তী কারুর প্রয়োজন কী নতুন করে? যে-কোনো রচনার আগে তিনি এই

প্রকার মুক্ত মনের অধিকারী হতে পারেন যে, তাঁর রচনার ব্যর্থতা বা সাফল্যের দায়িত্ব তাঁর নিজের। কোনো ব্যক্তি-বিশেষ বা গোষ্ঠী-বিশেষকে খুশী করার জন্ত তাঁর জীবন-মরণ নির্ভর করছে না।

অনেকে অবশ্ত বলবেন, কোনো সাহিত্যিক কি সত্যিই স্বাধীন থাকতে পারেন? কোনো না কোনো এস্টাব্লিশমেণ্টের খপ্পরে তাঁকে পড়তেই হবে। সেই এস্টাব্লিশমেণ্টের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারলে সব ঠিক আছে, কখনো বিরোধিতা করলেই তাঁকে আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে।

তত্ত্বগতভাবে এই বক্তব্যকে অস্বীকার করা যায় না। এস্টাব্লিশ-মেণ্টের অস্তিত্বও উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই। কিন্তু সব দেশে সব কালে এস্টাব্লিশমেণ্টের একই রকম ভূমিকা কি না, সেটাও চিন্তা করে দেখা দরকার। আমাদের দেশে অন্যান্ত অনেক কিছুর মতন এস্টাব্লিশমেণ্টও হয়তো দুর্বল। আমার সঙ্গে যে-কয়েকজন লেখকের পরিচয় আছে, তাঁদের কারুর মুখে কখনো শুনিনি যে, তাঁদের কোনো একটি রচনাও অন্ত কারুর পরামর্শ বা নির্দেশ অনুযায়ী লিখতে হয়েছে। এমনকি, কোনো লেখা ছাপা হবার মাঝখানে অন্ত কেউ হস্তক্ষেপ করেছে, এমন উদাহরণও আমার জানা নেই। যতদূর জানি, এদেশে কারুর কলমের স্বাধীনতা এখনো কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। খুশিমতন লেখার অধিকার সকলেরই আছে, প্রকাশের জায়গা হয়তো সীমায়িত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু স্বেচ্ছায় নিজ ব্যয়ে কিছু প্রকাশ করতে গেলে কেউ কি বাধা দিতে পারে? সাম্প্রতিককালে, একমাত্র উগ্রপন্থীদের মুখপত্রটিকে পুলিশের সাহায্যে জোর করে বন্ধ করে দেবার ঘটনা জানি, তার কোনো যুক্তি খুঁজে পাইনি। এবং আদালতের নির্দেশের আগে কোনো পত্র-পত্রিকা এভাবে বন্ধ করে দেওয়া নিশ্চিত নিন্দার যোগ্য।

যদিও পূর্ব গৌরব আর তেমন নেই, তবু ফরাসী দেশকে এখনো আমরা শিল্প-সাহিত্যের তীর্থভূমি মনে করি। সে দেশের অনেক

লেখক এবং শিল্পীই সরকারী কর্তৃত্বের কোনো তোয়াক্কা করেন না। তার জন্য তাঁদের বেঁচে থাকা বা রচনার কোনো অসুবিধে হয়নি। আমাদের দেশেও সেই রকম অবস্থাই কাম্য।

সাহিত্যিককে অনেকে সমালোচকের ভূমিকায় আনতে চান। কেউ কেউ বলেন, সাহিত্য হচ্ছে সমাজের বিবেক। এই বিবেকের দ্বারে যেন কখনো অর্গল না পড়ে।

আর একটা কথা। যে-লেখক সেই দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করতে চান, তাঁর সম্পর্কে অন্যের মাথা ব্যথার বিশেষ কারণ নেই। কারণ তিনি লড়াকু লেখক, তিনি প্রতিরোধের কথা আগে থেকেই জানেন। আমার মাথা ব্যথা সেই সব লেখক সম্পর্কে, যাঁরা এ-সব সাতে-পাঁচে থাকতে চান না। যাঁরা মনে করেন একটি সাহিত্য রচনা একটি সঙ্গীত বা চিত্রের মতন আপনাতে আপনিই সমৃদ্ধ, যার সৃষ্টি অনেকটা সাধনার মতন, যার উপাস্যের নাম সুন্দর। সেই সব লেখককে যেন নিরিবিলি থাকতে দেওয়া হয়।

শরৎকালের সময়টা বেশ। গ্রীষ্মের তাপ একটু কমে, বৃষ্টি আর বিরক্তিকর স্তরে থাকে না, আকাশে হালকা সাদা মেঘে নানা বিভ্রম তৈরি হয়। রেল লাইনের পাশে কাশ ফুল কিংবা গ্রাম্য পথে শিউলির রাশি এখনো ঝরে থাকে কি না জানি না, অনেকদিন দেখা হয়নি।

অনেকেই বলেন, আজকাল দুর্গা পূজার সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। তার তুলনায় অনেক বেশী বেড়েছে পূজা-সংখ্যা। কিছু দিনের মধ্যেই বিভিন্ন দোকানে শাড়ি-জামা-কাপড়ের মতনই ঝলমল করবে সব পূজা-সংখ্যা।

বসন্ত কালের বদলে শরৎকালে কবে থেকে এমন জাঁকজমকের সঙ্গে দুর্গা পূজা শুরু হলো, সে-সম্পর্কে অনেকেই অনেকরকম তথ্য জানিয়েছেন। রামচন্দ্র অকাল বোধন শুরু করেছিলেন—এটা মেনে নিলে রামচন্দ্রকে অবশ্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলেও মেনে নিতে হয়। সেরকম কোনো আলোচনা এখনো পড়িনি। বাল্মীকি রামায়ণ গান রচনা করে লব-কুশকে শিখিয়েছিলেন। বাল্মীকি কি লিখতে জানতেন? সেরকম কোনো প্রমাণ আছে কি?

ওসব কথা থাক, আসল কথায় আসি। পূজা-সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন পাঠক-মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে, আমি তাতে একটুখানি যোগ দিতে চাই। বাংলা পত্রপত্রিকার বিশেষ পূজা-সংখ্যার প্রবর্তন কবে থেকে শুরু হলো? বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের কি পূজা-সংখ্যা বেরিয়েছিল? তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পূজা-সংখ্যা প্রকাশের বোধহয় কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

অবশ্য, বর্তমানের পূজা সংখ্যাগুলির সঙ্গে ধর্মের কোনোই যোগ নেই। দুর্গা পূজার সময় বাঙালী হিন্দুদের দীর্ঘকালের ছুটি পাওনা হয়। সেই অনুসারে সবরকম অফিস-কাছারিই বন্ধ থাকে। বোনাস

বা অ্যাডভান্স হিসেবে অতিরিক্ত টাকা দেওয়া হয় চাকুরিয়াদের। কেনাকাটা বেড়ে যায় বলে সাধারণভাবে অর্থনৈতিক অবস্থাও একটু জোরালো হয়। অবশ্য এই উৎসবের আবহাওয়ায় যারা নিরন্ন এবং সংস্থানহীন—তাদের দৈন্য দশা অনেক বেশী প্রকট হয়ে ওঠে—কিন্তু সেটা অন্যদের আলোচনার বিষয়। সাহিত্য আলোচনায় নিরক্ষরদের প্রসঙ্গ যেমন অবান্তর।

একথা আর অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, বাংলা সাহিত্যের আবহাওয়ায় (পশ্চিমবঙ্গে) পূজা সংখ্যাগুলি একটি বিশেষ স্থান জবরদখল করে নিয়েছে। এখন আর এর মধ্যে ধর্মের কোনো স্থান নেই—অন্য ধর্মের পাঠক তো বটেই, হিন্দুদের মধ্যেও যারা এখন পূজাপার্বণের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, তারাও পূজা সংখ্যাগুলির জন্য আগ্রহী হয়ে থাকে। এবার পুজো কবে আরম্ভ—বারোয়ারি পূজার চাঁদা আদায়কারীরা ছাড়া অনেকেই তা বলতে পারবে না—কিন্তু পূজা-সংখ্যাগুলি কবে বেরুবে—সে সম্পর্কে অনেকেরই একটা আন্দাজ আছে।

গত কয়েক বছরে পূজা-সংখ্যাগুলির চরিত্রও বদল হয়েছে। যে-সমস্ত লেখকদের সারা বছর সন্ধান মেলে না—তাঁরাও অনেকে পূজা-সংখ্যায় উপস্থিত হন। অনেক লেখক তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা পূজা সংখ্যায় প্রকাশের জন্যই রেখে দেন। কোনো কোনো লেখক আবার এক সঙ্গে অনেক পূজা-সংখ্যার চাহিদা মেটাতে হিমসিম খেয়ে যান। এই তো সেদিন শুনলাম, কোনো কোনো লেখক নাকি একসঙ্গে গোটা একটা উপন্যাস শেষ না করে, একসঙ্গে দু'তিনখানা লিখতে আরম্ভ করেন—প্রতিদিন প্রত্যেকটার দু' পাতা পাঁচ পাতা লেখেন। শুনে আমি অবাক।

আগে পূজা-সংখ্যার মূল ঐশ্বর্য ছিল ছোট গল্প এবং প্রবন্ধ। অন্তত সাহিত্যের নানা বিভাগের একটা সামঞ্জস্য ছিল। এখন ছোট গল্পের সুদিন গেছে। উপন্যাসগুলির মাঝে-মাঝে পাতা ভরানোর

জন্যই ছোট গল্প থাকে। তবু যে ছোট গল্পগুলি এখনো অনেক উপন্যাসের চেয়েও বেশী শিল্পরস সম্মত—এটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার নিশ্চয়ই। কবিতার সম্মান অবশ্য এখন একটু ফিরেছে। আগে কবিতার স্থান ছিল পাদটীকা হিসেবে—পদতলে স্থান বলেই কবিতার আর এক নাম পদ্য—একথা বলেছিলেন যেন কে। এখন উচ্চাজের পত্রিকাগুলিতে কবিতার জন্য আলাদা জায়গা নির্দিষ্ট থাকে। অবশ্য সিনেমা পত্রিকাগুলি ছাড়া—তাঁরা ও-বস্তু ছুঁয়ে দেখেন না।

প্রবন্ধের অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়। ভালো প্রবন্ধ আজকাল কদাচিৎ চোখে পড়ে। তার কারণ ভালো প্রবন্ধকারের অভাব নিশ্চিত নয়, পৃষ্ঠপোষকের অভাব। প্রবন্ধ লেখার প্রেরণা থাকলে নিশ্চয়ই নতুন সুনীতিকুমার বা সুকুমার সেন-দের আমরা দেখতে পেতাম।

পূজা-সংখ্যাগুলির সিংহভাগ জুড়ে থাকেন ঔপন্যাসিকরা। এটাই নাকি যুগের হাওয়া। পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে সম্পাদকরা উত্তরোত্তর উপন্যাসের সংখ্যা বাড়াচ্ছেন। সত্যি, এক-এক সময় মনে হয়, বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন আমাদের ঔপন্যাসিকরা। অবশ্য এই প্রসঙ্গে টি এস ·এলিয়টের কথাটাও মনে পড়ে—এভরি জেনারেশান গেটস দা লিটরেচার ইট ডিজার্ভস।

এক বছরে কতগুলো পূজা-সংখ্যা বেরোয়? তিনশোর কম নয়। সাধারণ পাঠক সংখ্যাটা শুনলে চমকে যাবেন। তাঁর চোখের সামনে মাত্র জমকালো দশ-বারোখানি পত্রিকা। এছাড়া যে অসংখ্য ছোট ছোট সাহিত্য-পত্রিকা বেরোয়—যাদের ডাক নাম লিটল ম্যাগাজিন, তাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখেন শুধু বিশেষ উৎসাহীরা। এই সব কোনো কোনো পত্রিকা বাংলা কবিতা বা গদ্যের জগতে বিপ্লব আনবার দাবি করছে—অথচ স্টলে স্টলে তারা চাপা পড়ে থাকে বৃহদাকার সংখ্যাগুলির আড়ালে।

সাধারণভাবে মনে হয়, এই ধুমধাড়াক্কার সময় লিটল ম্যাগাজিনের

দূরে থাকাই ভালো। কিন্তু তাঁরা তা পারেন না একটি বিশেষ কারণে। লিটল ম্যাগাজিন ছাপা হয় সম্পাদকের বা উদ্যোক্তাদের পকেটের পয়সা দিয়ে। না আছে বিক্রি, না আছে বিজ্ঞাপনের ভরসা। এই পুজোর সময় বিজ্ঞাপনদাতারা অনেকেই একটু উদার প্রকৃতির হয়ে পড়েন—লিটল ম্যাগাজিনের ভাগ্যেও দু একটা বিজ্ঞাপন জুটে যায়। সেই লোভ সংবরণ করা যায় না।

অবশ্য কোনো-কোনো লিটল ম্যাগাজিন এই সময় আর একটা ভুল করেন। তাঁরা কোনো-কোনো খ্যাতনামা লেখকদের দ্বারস্থ হন, বিক্রি একটু বাড়াবার জন্য। তার ফল খুব সুখকর হয় না। অনেক লেখক ব্যস্ততার কারণে এঁদের ফিরিয়ে দেন। অনেকে চক্ষুলজ্জা এড়াতে না পেরে দায়সারা লেখা দিয়ে দেন একটা। তাতে লিটল ম্যাগাজিনের গৌরব বৃদ্ধি হয় না। অহংকারই লিটল ম্যাগাজিনকে মানায়।

লেখকের জীবন ও জীবনের লেখক

পথ দিয়ে পাঁচজন মানুষ হেঁটে যাচ্ছেন। ওঁদের মধ্যে একজন লেখক।

এতদিন ধরে আমাদের মনে এই রকম একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছিল যে, ঐ লেখকটি পাঁচজন মানুষের মধ্যে থেকেও আলাদা, তিনি বিশেষ, তিনি স্রষ্টা, তিনি ঈশ্বরের সমান। এই চিনি-মাখানো মিথ্যের অতি দ্রুত অবসান হওয়া উচিত। এই ভুল সম্মান লেখকদের শিরে বর্ষণ করে ক্ষতিই করা হয়েছে বেশী, এবং এ-কাজ করেছেন লেখকরাই। এক সময় যেমন ব্রাহ্মণরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রচার চালিয়ে প্রচুর সুযোগ-সুবিধে আদায় করে নিয়েছিলেন, সেই রকম এ-দেশের লেখকরাও। এবং তার ফলে এখন ব্রাহ্মণদের মতন লেখকরাও সাধারণ প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন অনেক সময়।

ঐ পাঁচজন মানুষের মধ্যে, লেখক, মানুষ হিসেবে কোনোক্রমেই বিশেষ নন বা শ্রেষ্ঠ নন। বরং, দেখা যাবে, অনেকের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রেই তিনি গুণে ন্যূন। বাকি চারজনের মধ্যে অন্তত দু-তিনজনের চেয়ে তাঁর শারীরিক শক্তি কম, মনের দিক দিয়ে অনুদার, অর্থব্যয়ে কৃপণ, ওঁদের সামনে একটি বাচ্চা ছেলে গাড়ি চাপা পড়লে দু-তিনজন অন্তত সাহায্যের জন্য ছুটে যাবেন, লেখক যাবেন না, তিনি বরং ঘটনাটা নোটবুকে টুকে নেবেন। তবু, আমরা লেখককে কেন বলবো অসাধারণ, কেন বলবো তিনি সকলের চেয়ে আলাদা?

মনে মনে, নিজের সৃষ্টি করা জগতে লেখক যখন সৃষ্টিশীল, তখন তিনি নিশ্চিত একজন নতুন দেবতা বা ময়-দানব। কিন্তু সৃষ্টির বিকাশের কোনো নিয়ম নেই, অর্থাৎ কোন্ অবস্থায় থাকলে একজন মানুষ লেখক হয়ে যায়, তা কেউ জানে না। সুতরাং লেখকের ব্যক্তিজীবনকে আলাদা করে দেখা অকারণ।

লেখকের পক্ষে ঐ পাঁচজনের মধ্যে সাধারণ অন্যতম না হয়ে উপায় নেই। নইলে তিনি বাকি চারজনের কথা লিখবেন কী করে? অথবা তিনি লিখবেন শুধু নিজের জীবনের কথা, এবং পাঠক যিনি ঐ বাকি চারজনের মধ্যে আছেন, তিনি তা নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন। ঐ পাঁচজন মানুষের কথা ব্যতীত, যে-রকমভাবে যে-রকম ভাষাতেই বলা হোক না কেন—আর কিছুই সাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে না। রোমান্স, রূপকথা বা তথাকথিত ঐতিহাসিক উপন্যাস—এসব আজকাল আর সাহিত্য নয়, রম্যরচনা—কিছু সময় কাটাবার উপকরণ। একটি লোকের একটি পা কাটা, তিনি বিছানায় শুয়ে ক্রিকেট খেলার বিবরণ পড়ে যেমন আনন্দ পান, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' পড়ে সেই আনন্দই পান, অথচ ক্রিকেট লেখকের বদলে 'ঐতিহাসিক উপন্যাসের' প্রণেতাকে সাহিত্যিক বলে আলাদা সম্মান দেবার কোনো কারণ নেই। সাহিত্যের আলোচনায় দুটিই সমান অবান্তর।

সাহিত্যের উপাদান এবং সাহিত্যিক, আধুনিক জগতে এরা একটি শ্রেণীর, এ-কথাটা বার বার বলা দরকার। রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয়েছিল, 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক। আমি তোমাদেরই লোক।'—এ-কথাও রবীন্দ্রনাথকে লিখে জানাতে হয়েছিল যে, কবিও তোমাদেরই লোক, সে আলাদা গজদন্ত মিনারবাসী নয়। লিখে জানাতে হয়েছিল, কারণ, এ-কথা স্বতঃসিদ্ধভাবে এ-দেশে প্রতিষ্ঠা পায়নি। এখনও পায় না।

লেখক নিজেকে আলাদা মনে করে ক্রমশ দূরে সরে যান। যে মানুষ একটা বিশাল ব্রিজ বানাবার নকশা আঁকছে, যে কয়েকটা সামান্য তার জড়িয়ে আকাশ থেকে গান ধরার যন্ত্র বানাচ্ছে, যে প্রত্যেক দিন অনেক স্ত্রী-পুরুষের অসুখ সারাচ্ছে, অথবা যে সাধারণ কেরানীটি সারাদিন খেটে-খুটে নিজের সংসার নামক শিল্পটিকে টিঁকিয়ে রাখছে, তার তুলনায় একজন লেখক কী এমন অসাধারণ বা সম্মানযোগ্য? এই আলাদা সম্মান পেয়ে, শেষ পর্যন্ত লেখকদেরও সম্মানযোগ্য হবার মতো একটা মুখোশ পরতে হয়। এই মনোবৃত্তি থেকেই দেখা যায়, লেখকদের জীবনীতে কোথাও তাঁদের ক্ষুদ্রতা, ঈর্ষা, স্খলন, পতনের উল্লেখ থাকে না। ফলে পাঠকদের চোখে লেখকের 'মহাপুরুষ' হিসেবে ছবি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। পাঠক চমৎকৃত হয়ে ভাবেন, লেখক কি ম্যাজিসিয়ান? নইলে নিজে অমন মহাপুরুষ হয়েও আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ-ঈর্ষার কথা জানলেন কী করে।

আমাদের দেশে লেখকদের প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির ফলাফলও বড় অদ্ভুত। খ্যাতি ও স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থাগম হতে শুরু করলেই তিনি প্রথমেই চট করে একটা বাড়ি বানিয়ে ফেলবেন। তার পরেই একটা মোটরগাড়ি। এগুলোর কোনোটাই খারাপ নয়, বরং খুব জরুরি। ইহজীবনে কষ্ট করে পরজীবনে সুখ পাবার ধারণা আজকাল এমন টলে গেছে যে, যা-কিছু স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগের সামগ্রী খুব

তাড়াতাড়ি পেতে সকলেরই লোভ। কিন্তু এর ব্যবহারগুলিই হয় বিচিত্র। খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে যান সাধারণ জীবন থেকে। মোটর গাড়ি চড়ে যাওয়া আসা, একদিন গাড়ি খারাপ হলে মহা রাগারাগি, সেদিন আর বেরুনোই হয় না, ট্যাকসিও যা দুর্লভ—ফলে তিনি সেই আর-চারজন মানুষকে দেখেন দূর থেকে, কিছু ভক্ত, অনুগ্রাহক ও প্রকাশকদের নিয়েই তখন তাঁর জগৎ। নিমন্ত্রণ ছাড়া তিনি আর কোনো সভায় যান না, নিমন্ত্রণ ছাড়া তাঁর দেশ ভ্রমণ হয় না, বন্ধুরা সবাই ঈর্ষায় বা উদাসীনতায় দূরে সরে যায়, লেখক তখন নিঃসঙ্গ, নির্বাসিত, দূর থেকে অসহায়ভাবে তিনি দেখছেন দূরের স্রোতোময় জগৎ। অনেকে তাও দেখেন না আর, চোখ বুজে দিবাস্বপ্ন দর্শন শুরু করেন।

সব পেশারই একটা নিয়ম আছে। ব্যবসায়ী যতই ধন্য হয়ে পড়ুন, হিসেবের খাতাটা রোজ একবার নিজে দেখবেনই। প্রতিষ্ঠিত লেখকই শুধু নিজের অভিজ্ঞতা ও উপাদানের ভাণ্ডার সম্পর্কে খোঁজ করতে ভুলে যান। ফলে তিনি কাল্পনিক, অবাস্তব এবং পুনরাবৃত্তি-মূলক কাহিনী লিখতে শুরু করেন। ভাষার ওপরে তাঁর তখন অনায়াস অধিকার, সুতরাং যে-কোনো রচনাই মনোরঞ্জক হতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের অগ্রগতির পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকারক হল, এই সব কাল্পনিক, বানানো গল্প। এই সব লেখা আধুনিকতার পিঠে ছুরি মারে। বিশেষত, প্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় লেখকরা যখন এ-সব রচনা লিখতে শুরু করেন, তখন সাহিত্য আবার ঐ দিকে মোড় নেয়, অনুকারকরাও ওরকম লেখা মক্স করেন, পাঠকরাও ঐ সব মনোরঞ্জক কাহিনীই দাবী করেন। অথচ সাহিত্যের কাজ যদি হয় এ জীবন, এ পৃথিবীকে বদলানো, তখন, এই ক্ষুদ্রায়িত, মাথার ওপরে দণ্ডাজ্ঞার ছায়াময় পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতাই লিখতে হবে লেখককে। লেখার স্টাইল বা রীতি যা-ই হোক না। ফ্রানৎস কাফ্‌কা একজন অতিশয় ইমাজিনেটিভ বা সিমবলিস্ট লেখক, কিন্তু একথা আজ আমরা

সকলেই জানি যে, তাঁর প্রতিটি চরিত্র বাস্তব, তাঁর চারপাশের জীবন দিয়ে তিনি তাঁদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়েছেন। লেখকের এই বিশেষ সম্মান বা দূরে সরানো, বোধ হয় আমাদের দেশেই বেশী। নইলে, মহাসমুদ্রের ওপারের দেশগুলিতে দেখি, যতবড় সূক্ষ্ম ধরনের লেখকই হোন, ব্যক্তিজীবনে তিনি দেশকাল সম্পর্কে অতি সজাগ, তাঁর দায়িত্ববোধ আর-চারজনের মতই স্পষ্ট ও তীব্র। দেশের সঙ্কটের সময় শুধু লিখেই কাজ না সেরে, মানুষ হিসেবেও যোগ দিয়েছেন। ফরাসী দেশের এমন বড় লেখক নেই—যিনি পর পর দুটি মহাযুদ্ধের পক্ষে বা বিপক্ষে যোগদান করে জীবন বিপন্ন করেননি। লড়াই করেছেন সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে। আমাদের দেশে এ-রকম যুদ্ধে যোগ দেবার দরকার হয়নি, কিন্তু যুদ্ধের চেয়ে বড় বড় সঙ্কট এসেছে, সে-সব সময়ে লেখকরা হয় শুধু বাণী দিয়েছেন, অথবা চুপ করে থেকেছেন।

শুধু সঙ্কট কেন? এই শতাব্দীর ভারতবর্ষের নিশ্চিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা। এর চেয়ে বড় ঘটনা একটা দেশের পক্ষে আর হতে পারে না। এই স্বাধীনতা এবং পরবর্তী ভারতবর্ষের চিত্র ও মানসিকতা আমাদের সাহিত্যে কতখানি উপস্থিত হয়েছে? মাইলের পর মাইল জঙ্গল কেটে তৈরি হলো দুর্গাপুর, দুর্দান্ত দামোদরের ওপর দিয়ে বিশাল বাঁধ তৈরি হলো, এদিক-সেদিকে চলে গেল রেল লাইন, যে-গ্রামের মানুষ জীবনে কখনো বিজলী বাতি দেখেনি—সে-গ্রামের নতুন তৈরি ইস্কুলবাড়িতে এখন বিজলী পাখা ঘুরছে। এই এতগুলো বছরে মানুষের জীবনযাত্রার মান যতখানি বদল হোক না-হোক, এই সব প্রাকৃতিক পরিবর্তনেরও কোনো সার্থক ছবি সাহিত্যে ইতিহাস হলো না।

এই ব্যর্থতার কারণগুলিই আমরা প্রথমে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। স্বাধীনতার আগেকার যে-সব লেখক আজও সৃষ্টিশীল, তাঁরা আমাদের দেশের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দূরে সরে গেছেন।

সমকালীন থেকে বিচ্ছিন্ন। সুতরাং কাল্পনিক অবাস্তব কাহিনী সৃষ্টিতে ব্যস্ত। অথবা লিখছেন পূর্ব অভিজ্ঞতা, যৌবনের দেখা মানুষগুলিকে নিয়েই। অনেকেরই রচনার পটভূমি ১৯৪০-এর বাংলা দেশ হলেও মানুষগুলি ১৯৪০-এর। কারণ, একেবারে সাম্প্রতিক জীবন লেখকরা দেখছেন দূর থেকে, নিজে জনতার মধ্যে মিশে নয়।

তরুণ লেখকরা এদিক দিয়ে আরও ব্যর্থ। এই বিশাল পরিবর্তনের ছাপ তাঁদের রচনাতেও একেবারে অনুপস্থিত। কলকাতা শহরই জীবিকার প্রধান কেন্দ্র হওয়ায় তাঁরা এই আবর্তে ঘুরে মরছেন। পথে পথে তাঁরা ঘুরছেন অসহায়, অধিকাংশ সময়ই কেটে যাচ্ছে জীবিকার সন্ধানে। কারণ, সাহিত্য-সৃষ্টির চেয়েও শুধু বেঁচে থাকা অনেক বড় কথা। সুতরাং এক ধরনের অভিমানে তাঁরা নিজেদের ক্রমশ আরও গুটিয়ে আনছেন, তাঁদের লেখা হয়ে যাচ্ছে অতিশয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক। বিস্তীর্ণ পটভূমিকার মধ্যে আত্মাবিষ্কারের বদলে তাঁরা নিজেকে দেখছেন সঙ্কীর্ণ বদ্ধ ঘরে। অনেকে শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে না-পেরে, অসহায়, ক্লান্ত ভঙ্গিতে নুয়ে পড়ে নিজেকেও মিশিয়ে দিচ্ছেন প্রচলিত রোমান্সসাহিত্যের স্রোতে।

তা ছাড়া, যৌবনের ধর্মই হলো বিদ্রোহ। প্রবীণের দায়িত্ব স্থিতি এবং পালন। তরুণ লেখকরা সব দেশেই সর্বকালে ভোলানাথের চেলা।

বাড়ির দুরন্ত ছেলে নানান জায়গা থেকে ফলমূল ও ঐশ্বর্য আহরণ করে এনে মা-বাবাকে দেয়। দিয়ে বলে, সাবধান, যেন হারায় না। আবার সে চলে যায়। তেমনি যতদিন এ দেশে স্বাধীনতা আসেনি, তখন পরাধীনতাকে ভেঙেচুরে স্বাধীনতাকে আনবার জন্য তখনকার তরুণ লেখকরা ব্যগ্র ছিল। এখন সেই স্বাধীনতা পাবার পর, তাকে প্রতিপালনের দায়িত্ব পরিবারের প্রবীণদের। পরবর্তী তরুণ লেখকের দল চলে যাবে অন্যরকম স্বাধীনতার সন্ধানে।

—শেষ—